

উপকথা ।

অর্থাৎ

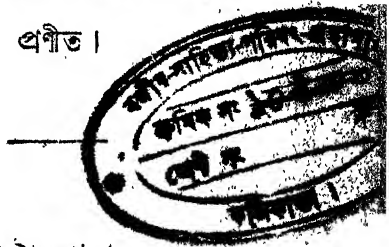
কুদ্ কুদ্ উপন্যাস সংগ্রহ



শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

* ৮০৭

প্রণীত ।



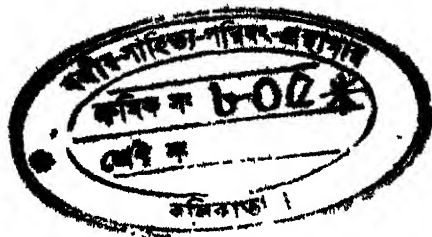
কাঁটালপাড়া ।

বঙ্গদর্শন যন্ত্রে শ্রী বাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

১৮৭৭ ।

ব. সা. প. পু
ক্রীত ভাং.....

ইন্দ্রা ।



ইন্দিরা ।



প্রথম পরিচ্ছেদ ।

অনেক দিনের পর আমি খশুর বাড়ী যাইতেছিলাম । আমি উনিশ বৎসরে পড়িয়াছিলাম, তথাপি এ পর্য্যন্ত খশুরের ঘর করি নাই । তাহার কারণ, আমার পিতা ধনী, খশুর দরিদ্র । বিবাহের কিছু দিন পরেই খশুর আমাকে লইতে লোক পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু পিতা পাঠাইলেন না । বলিলেন, “বিহাট্টে পলিও, নে, আগে আমার জামাতা উপার্জন করিতে শিখুক—তার পর বধু লইয়া যাইবেন—এখন আমার মেয়ে লইয়া গিয়া খাওয়াইবেন কি ?” শুনিয়া আগার স্বামীর মনে বড় ঘৃণা জন্মিল—তাঁহার বয়স তখন ২০ বৎসর, তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে স্বয়ং অর্থোপার্জন করিয়া পরিবারপ্রতিপালন করিবেন । এই ভাবিয়া তিনি পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিলেন । তখন রেইন ধর নাই—পশ্চিমের পথ অতি দুর্গম ছিল । তিনি পদব্রজে, বিপুল অর্থে, বিনা সহায়ে, সেই পথ অতিবাহিত করিয়া, পঞ্জাবে পৌঁছিয়া উপস্থিত হইলেন । যে ইহা পারে, সে অর্থোপার্জন করিতেও পারে । স্বামী অর্থোপার্জন করিতে লাগিলেন—বাড়ীতে টাকা

পাঠাইতে লাগিলেন—কিছু সাত আট বৎসর বাড়ী আসিলেন না, বা আমার কোন সন্বাদ লইলেন না। যে সময়ের আমাব ইতিহাস স্মরণ করিতেছি, তাহার কিছু পূর্বে তিনি বাড়ী আসিলেন। বব উঠিল যে, তিনি কমিসেরিয়েটেব (কমিসেরিয়েটে বটে ত?) কর্ম করিয়া অতুল ঐর্ষ্যের অধিপতি হইয়া আসিয়াছেন। আমার স্বপ্নে আমাব পিতাকে লিখিয়া পাঠাইলেন, “আপনাব আশীর্বাদে উপেক্ষ (আমার স্বামীব নাম উপেক্ষ—নাম ধরিলাম, প্রাচীনারা মার্জনা করিবেন; হাল আঠান তাঁহাকে আমার “উপেক্ষ” বলিলা ডাকাই সম্ভব)—বধুমাতাকে প্রতিপালন করিতে সক্ষম। পাকী বেহাবা পাঠাইলাম, বধুমাতাকে এ বাড়ীতে পাঠাইয়া দিবেন। নচেৎ অজ্ঞা করিলে পুত্রের বিবাহের আবার সম্বন্ধ করিব।”

পিতা দেখিলেন, নূতন বড়মামুষ বটে। পাকী খানার ভিতরে কিংখাপ মোড়া, উপরে রূপার বিট, বাটে রূপার হাঙ্গরের মুখ। শাসী মাপী যে আসিয়াছিল, সে গরদ পরিয়া আসিয়াছে, গলায় বড় হোটা সোনার দানা। চারিজন কালো দাড়িওয়ালা ভেঁজপুরে পাকীর সঙ্গে আসিয়াছিল।

আমার পিতা হরমোহন দত্ত বুনিয়াদি বড়মামুষ। হাসিয়া বলিলেন, “মা, ইন্দিরে! আর তোমাকে রাখিতে পারি না। এখন যাও, আবার শীঘ্র লইয়া আসিব। দেখ, আঙ্গুল ফুলে কলংগেছে দেখিরা হাসিওনা।”

তাই আমি সুস্তর বাড়ী যাইতেছিলাম। আমার স্বস্তর বাড়ী মনোহরপুর। আমার পিতামহ মনোহরপুর; উভয় গ্রামের মধ্যে ~~কি~~ পথ। সুস্তর গ্রামে অহির করিয়া যাত্রা করিয়াছিলাম, পোহিতে পাচ সাতদণ্ড রাত্রি হইবে, জানিতাম। বধে কালাদীর্ঘ নামে এক বৃহৎ দীর্ঘিকা আছে। তাহার কল

প্রায় অর্ধক্রোশ : পাহাড় পর্বতের স্তায় উচ্চ। তাহার ভিতর দিয়া পথ। চারি পার্শ্বে বট গাছ। তাহার ছায়া শীতল, জল নীলমেঘের মত, দৃশ্য অতি মনোহর। তথায় মনুষ্যের সফাগর বিরল। ঘাটের উপরে একখানি দোকান আছে মাত্র। নিকটে যে গ্রাম আছে, তাহারও নাম কালাদীঘী।

এই দীঘীতে একা লোক জন আসিতে ভয় করিত। দস্যুতার ভয়ে এখানে দলবদ্ধ না হইয়া লোক আসিত না। এষ্ট জন্য লোকে “ডাকাতে কালাদীঘী” বলিত। দোকান-দারকে লোকে দস্যুদিগের সহায় বলিত। আমার সে সকল ভয় ছিলনা। আমার সঙ্গে অনেক লোক—ঘোলজন বাহক, চারি জন দ্বারবান্, এবং অস্ত্রাস্ত্র লোক ছিল।

যখন আমরা এইখানে পৌঁছিয়াম, তখন বেলা আড়াই প্রহর। বাহকেরা বলিল, “যে আমরা কিছু জল টল না খাইলে আর যাইতে পারি না।” দ্বারবানেরা বারণ করিল—বলিল, “এ স্থান ভাল নয়।” বাহকেবা উত্তর করিল, “আমরা এত লোক আছি—আমাদিগের ভয় কি?” আমরা সঙ্গে লোক জন ততক্ষণ কেহট কিছুই খায় নাই। শেষে সকলেই বাহকদিগের মতে মত করিল।

দীঘীর ঘাটে—বটতলায় আদার পার্বী নানাটল। আমি ক্ষণেক পরে, অসুভবে বুদ্ধিলাভে যে লোক জন তফাতে গিয়াছে। আমি তখন সাহস পাটয়া অল্প দ্বার খুলিয়া দীঘী দেখিতে লাগিয়াম। দেখিলাম, বাহকেরা সকলে দোকানের সম্মুখে, এক বটবৃক্ষতলে বসিয়া জলপান খাইতেছে। সেই স্থান আমা নিকট হইতে প্রায় দেড় বিঘা। দেখিলাম যে, সম্মুখে ঠাঠি নিবিড় মেঘের স্তায়, বিশাল দীর্ঘিকা বিস্তৃত রহিয়াছে, চারি পার্শ্বে পর্বতশ্রেণী৬৭ উচ্চ অগ্ৰহ সুকোমল শ্যামল রূপাবরণ-

শোভিত “পাহাড়;”—পাহাড় এবং জলের মধ্যে বিস্তৃত
ভূমিতে দীর্ঘ বৃক্ষশ্রেণী; পাহাড়ে অনেক গোবৎস চরিতেছে—
জলের উপরে জলচর পক্ষিগণ ক্রীড়া করিতেছে—মুহু পবনেনব
মুহু তরঙ্গহিল্লোলে স্ফটিক ভঙ্গ হইতেছে—কুদ্রোশ্মিপ্ৰতিঘাতে
কদাচিত্ জলজ পুষ্পপত্র এবং শৈবাল ভুলিতেছে। দেখিতে
পাইলাম যে আমার দ্বারবানেরা জলে নামিয়া স্নান করিতেছে
—তাহাদের অঙ্গচালনে তীক্ষ্ণ হঠিয়া স্তমসলিলে শব্দ
মুক্তাহার বিক্ষিপ্ত হইতেছে। দেখিলাম যে বাহকেবা ভিন্ন
আমার সঙ্গে লোক সকলেই এককালে স্নানে নামিয়াছে।
সঙ্গে হইলেন স্ত্রীলোক—একজন শিশুর বাড়ীর, একজন বাপের
বাড়ীর, উভয়েই জলে। আমার মনে একটু ভয় হইল—কেহ
নিকটে নাই—স্নান মন্দ, ভাল করে নাই। কি করি, আমি
কুলবধু মুখ ফুটিয়া কাহাকে ডাকিতে পারিলাম না।

এমত সময়ে পাহাড়ী অপবপার্শ্বে কি একটা শব্দ হইল।
যেন উপরিস্থ বটবৃক্ষের শাখা হঠতে কিছু গুরুপদার্থ পড়িল।
আমি সে দিকের কপাট অল্প খুলিয়া দেখিলাম। দেখিলাম, সে
এক কুম্ভবর্ণ বিকটাকার মনুষ্য।

দেখিতে আর এক জন মানুষ গাছের উপর হঠতে লাফাটয়া
পড়িল! দেখিতে দেখিতে আর একজন, আবার একজন! এইরূপে
চারিজন প্রায় এক কালীনই গাছ হঠতে লাফাটয়া পড়িয়াই
—পাকী স্বন্ধে করিয়া উঠাইল। উঠাটয়া উদ্ধ্বাসে ছুটিল।

দেখিতে পাইবা আমার দ্বারবানেরা “কোন হার রে!
কোন হার রে!” রব তুলিয়া জল হঠতে দৌড়িল।

তখন বুঝিলাম যে, আমি দস্যুহস্তে পড়িয়াছি। তখন আর
লক্ষ্য কি করে! পাহাড়ী উভয় দ্বার মুক্ত করিলাম। দেখিলাম
যে, আমার সঙ্গে সকল লোক অত্যন্ত কোলাহল করিয়া পাহাড়

পশ্চাতে ধাবিত হইয়াছে। প্রথমে ভরসা হইল। কিন্তু শীঘ্রই সে ভরসা দূর হইল। তখন নিকটস্থ অন্যান্য বৃক্ষ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া বহুসংখ্যক দস্যু দেখা দিতে লাগিল। আমি বলিয়াছি, জলের ধারে বটবৃক্ষের শ্রেণী। সেই সকল বৃক্ষের নীচে দিয়া দস্যুরা পাকী লইয়া যাইতেছিল। সেট সকল বৃক্ষ হইতে মনুষ্য লাফাইয়া পড়িতে লুগিল। তাহাদের কাহারও হাতে বাঁশের লাঠি, কাহারও হাতে বটের ডাল।

লোকসংখ্যা অধিক দেখিয়া আমার সকলের লোকেরা পিছাইয়া পড়িতে লাগিল। তখন আমি নিতান্ত হতাশাস হইয়া মনে করিলাম, লাফাইয়া পড়ি। কিন্তু বাহকেরা যেরূপ দ্রুত বেগে যাইতেছিল—তাহাতে পাকী হইতে নামিলে আঘাত-প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিশেষতঃ একজন দস্যু আমাকে লাঠি দেখাইয়া বলিল যে, “নামিবি ত মাথা ভাঙ্গিয়া দিব।” স্মরণঃ আমি নিরস্ত হইলাম।

আমি দেখিতে লাগিলাম যে, একজন দ্বারবান অগ্রসর হইয়া আসিয়া পাকী ধরিল, তখন একজন দস্যু তাহাকে লাঠির আঘাত করিল। সে অচেতন হইয়া মৃত্যুকাতে পড়িল। তাহাকে আর উঠিতে দেখিলাম না। বোধ হয়, সে আর উঠিল না।

ইহা দেখিয়া অবশিষ্ট রক্ষীগণ নিরস্ত হইল। বাহকেরা আমাকে নির্ঝিল্পে লইয়া গেল। রাত্রি এক প্রহর পর্যন্ত তাহারা এইরূপ বহন করিয়া পরিশেষে পাকী নামাইল। দেখিলাম, সে স্থান নিবিড় বন—অন্ধকার। দস্যুরা একটা মশাল জ্বালিল। তখন আমাকে কহিল, “তোমার বাহা কিছু আছে, ~~কি~~—নহিলে প্রাণে মারিব।” আমার অলঙ্কার বস্ত্রাদি সকল দিলাম—অঙ্কের অলঙ্কারও খুলিয়া দিলাম। তাহারা একখানি মণি

শীর্ণ বস্ত্র ছিল, তাহা পরিয়া পরিধানের বহুদূলা বস্ত্র ছাড়িয়া দিলাম। দস্যুরা আমার সর্ব্ব্ব লইয়া, শাকী ভাঙ্গিয়া কণা খুলিয়া লইল। পরিশেষে অগ্নি জালিয়া ভগ্ন শিবিকা দাহ করিয়া দস্যুতার চিহ্নমাত্র লোপ করিল।

তখন তাহারাও চলিয়া যায়! সেই নিবিড় অরণ্যে, অন্ধকার রাজ্যে, আমাকে বন্যপশুদিগের মুখে সমর্পণ করিয়া যায় দেখিয়া, আমি কাঁদিয়া উঠিলাম। আমি কহিলাম, “তোমাদিগের পক্ষে পড়ি, আমাকে সঙ্গে লইয়া চল।” দস্যুর সংসর্গও আমার স্পৃহণীয় হইল।

এক প্রাচীন দস্যু সক্রমভাবে বলিল, “বাছা! অনন্য রাজা মেয়ে আমরা কোথায় লইয়া যাইব? এ ডাকাতির এখনি সোহবত হইবে—তোমার মত রাজা মেয়ে আমাদের সঙ্গে দেখিলেই আমাদের ধরিবে।”

একজন যুবা দস্যু কহিল, “আমি ইঁহাকে লইয়া ফাটকে যাই, সেও ভাল, তবু ইঁহাকে ছাড়িতে পারি না।” সে আর বাছা বলিল, তাহা লিখিতে পারি না—এখন মনেও আনিতে পারি না। সেই প্রাচীন দস্যু ঐ দলের সর্দার। সে যুবাকে লাঠি দেখাইয়া কহিল, “এই লাঠির বাড়ি এইখানে তোমার শাখা ভাঙ্গিয়া রাখিয়া যাইব। ও সকল পাপ কি আমাদের সম্বন্ধ?” তাহারা চলিয়া গেল। যতক্ষণ তাহাদিগের কথাবার্তী শুনা গেল—ততক্ষণ আমার জ্ঞান ছিল। তার পর সেইখানে আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

যখন আমার চৈতন্য হইল, তখন কাক কোকিল ডাকিতেছে। বংশপত্রাবচ্ছেদে বালাকর্ণকিরণ ভূমে পতিত হইরাছে। আমি গাছোখান করিয়া গ্রামাঙ্কুসন্ধানে গেলাম। কিছু দূর গিয়া এক খানি গ্রাম পাইলাম। আমার পিজালর বে গ্রামে, সেই গ্রামের সন্ধান করিলাম; আমার খণ্ডরালয় যে গ্রামে, তাহারও সন্ধান করিলাম। কোন সন্ধান পাইলাম না। দেখিলাম, আমি ইহার অপেক্ষা বনে ছিলাম ভাল। একে লজ্জায় মুখ কুটিয়া পুরুষের সঙ্গে কথা কহিতে পারি না, যদি কই, তবে সকলেই আমাকে যুবতী দেখিয়া আমার প্রতি সতৃষ্ণকটাক্ষ করিতে থাকে। কেহ বাঙ্গ করে—কেহ অপমানস্থক কথা বলে। আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, “এই খানে মরি, সেও ভাল; তবে আব পুরুষের নিকট কোন কথা জিজ্ঞাসা করিব না।” জীলোকেরা কেহ কিছু বলিতে পারিল না—তাহারাও আমাকে জহ্ন মনে করিতে লাগিল বোধ হয়, কেন না তাহারাও বিশ্বিতের মত চাহিয়া রহিল। কেবল একজন প্রাচীনা বলিল, “মা, তুমি কে? অমন সুন্দর মেয়ে কি পথে ঘাটে একা বেরুতে আছে? আহা মরি, মরি, কি রূপ গা! তুমি আমার ঘরে আইস।” তাহার ঘবে গেলাম। সে আমাকে ক্ষুধাতুরা দেখিয়া ঝাইতে দিল। সে মহেশপুর চিনিত। তাহাকে আমি বলিলাম যে তোমাকে টাকা দেওয়াইব—তুমি আমাকে রাখিয়া আইন। তাহাতে সে কহিল যে, আমার ঘর সংসার কেলিয়া যাইব কি প্রকারে? তখন সে যে পথ বলিয়া দিল, আমি সেই পথে গেলাম। সন্ধ্যা পর্যন্ত পথ হাঁটলাম—তাহাতে অত্যন্ত শ্রান্তি বোধ হইল। একজন পথিককে জিজ্ঞাসা করিলাম, “হাঁ গা,

মহেশপুর এখান হইতে কত দূর ?” সে আমাকে দেখিয়া স্তম্ভিতের মত রহিল। অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিল, “তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ ?” বে গ্রামে প্রাচীনা আমাকে পথ বলিয়া দিরাছিল, আমি সে প্রামের নাম করিলাম। তাহাতে পথিক কহিল যে, “তুমি পথ ভুলিয়াছ। বরাবর উর্টা আসিয়াছ। মহেশপুর এখান হইতে দুই দিনের পথ।”

আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা কবিলাম, “তুমি কোথায় বাইবে ?” সে বলিল, “আমি এষ্ট নিকটে গৌবীগ্রামে যাইব।” আমি অপত্যা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম।

গ্রামমধ্যে প্রবেশ কবিয়া সে আমাকে জিজ্ঞাসা কবিল, “তুমি এখানে কাহাব বাড়ী বাইবে ?” আমি কহিলাম, “আমি এখানে কাহাকেও চিনি না। একটা গাছতলায় শয়ন কবিয়া থাকিব।”

পথিক কহিল, “তুমি কি জাতি ?”

আমি কহিলাম, “আমি কায়স্থ।”

সে কহিল, “আমি ব্রাহ্মণ। তুমি আমার সঙ্গে আইস। তোমার মথনা মোটা কাপড় বটে, কিন্তু তুমি বড় ঘরের মেয়ে। ছোট ঘরে এমন রূপ হয় না।”

ছাই রূপ। ঐ রূপ, রূপ, শুনিয়া আমি আলাতন হইয়া উঠিয়াছিলাম। কিন্তু এ ব্রাহ্মণ প্রাচীন, আমি তাঁহাব সঙ্গে গেলাম।

আমি সে রাত্রে ব্রাহ্মণের গৃহে, দুই দিনের পব একটু বিশ্রামলাভ কবিলাম। পবদিন প্রাতে উঠিয়া দেখিলাম যে, আমার অভ্যস্ত গাত্রবেদনা হইয়াছে। পা ফুলিয়া উঠিয়াছে। বসিবার শক্তি নাই।

যত দিন না গাজেব বেদনা আরাম হইল, ততদিন আমাকে কক্ষের কাজেই ব্রাহ্মণের গৃহে থাকিতে হইল। ব্রাহ্মণ ও তাঁহার গৃহিণী আমাকে যত্ন কবিয়া রাখিলেন। কিন্তু মহেশপুত্র নাইবার কোন উপায় দেখিলাম না। কোন জীলোকেই পণ চিনিও না, অথবা যাইতে স্বীকার কবিল না। পুরুষে অনেকেই স্বীকৃত হইল—কিন্তু তাহাদিগের সঙ্গে একাকিনী যাইতে ভয় করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণও নিবেদন করিলেন। বলিলেন, “উহাদিগের চরিত্র ভাল নহে, উহাদিগের সঙ্গে যাইও না। উহাদের কি মতলব বলা যায় না। আমি ভদ্রসন্তান হইয়া তোমার ন্যায় সুন্দরীকে পুরুষের সঙ্গে কোথাও পাঠাইতে পারি না।” স্মরণ্য আমি নিরস্ত হইলাম।

একদিন শুনিলাম যে ঐ গ্রামের কৃষ্ণদাস বাবু নামক একজন ভদ্রলোক সপরিবারে কলিকাতায় যাইবেন। শুনিয়া আমি ইহা উত্তম সুযোগ বিবেচনা করিলাম। কলিকাতা হইতে আমার পিত্রালয় এবং শ্বশুরালয় অনেক দূর বটে, কিন্তু সেখানে আমার জ্ঞাতি খুল্লতাত বিষয়কর্ম্মোপলক্ষে বাস করিতেন। আমি ভাবিলাম, যে কলিকাতায় গেলে অবশ্য খুল্লতাতের সন্ধান পাইব। তিনি অবশ্য আমাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিবেন। না হয়, আমার পিতাকে সম্বাদ দিবেন।

আমি এই কথা ব্রাহ্মণকে জানাইলাম। ব্রাহ্মণ বলিলেন, “এ উত্তম বিবেচনা করিয়াছ। কৃষ্ণদাস বাবুর সঙ্গে আমার জানা শুনা আছে। আমি তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া বলিয়া দিয়া আসিব। তিনি প্রাচীন, আর বড় ভাল মানুষ।”

ব্রাহ্মণ আমাকে কৃষ্ণদাস বাবুর কাছে লইয়া গেলেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন, “এটি ভদ্রলোকের কন্যা। বিপাকে পড়িয়া পথ হারাইয়া এ দেশে আসিয়া পড়িয়াছেন। আপনি যদি

ইহাকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় লইয়া যান, তবে এ অনাধিনী আপন পিত্রালয়ে পহুঁছিতে পারে।” কৃষ্ণদাস বাবু সম্মত হইলেন। আমি তাঁহার অন্তঃপুরে গেলাম। পরদিন তাঁহার পরিবারস্থ জীলোকদিগের সঙ্গে কলিকাতা যাত্রা করিলাম। প্রথমদিন চারি পাঁচ ক্রোশ হাঁটিয়া গঙ্গাতীরে আসিতে হইল। পর দিন নৌকায় উঠিলাম।

কলিকাতায় পহুঁছিলাম। কৃষ্ণদাস বাবু কালীঘাটে পূজা দিতে আসিয়াছিলেন। ভবানীপুরে বাসা করিলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

“তোমার খুড়ার বাড়ী কোথায়? কলিকাতায় না ভবানী-পুরে?”

তাহা আমি জানিতাম না।

জিজ্ঞাসা করিলেন, “কলিকাতার কোন্ জায়গায় তাঁহার বাসা?”

তাহা আমি কিছুই জানিতাম না। আমি জানিতাম, বেমন মহেশপুর একখানি গওগ্রাম, কলিকাতা তেমনি একখানি গওগ্রাম যাত্র। একজন ভদ্রলোকের নাম করিলেই লোকে বলিয়া দিবে। এখন দেখিলাম যে, কলিকাতা অনন্ত অট্টালিকার সমুদ্র বিশেষ। আমার জ্ঞাতি খুড়াকে সন্ধান করিবার কোন উপায় দেখিলাম না। কৃষ্ণদাস বাবু আমার হইয়া অনেক সন্ধান করিলেন, কিন্তু কলিকাতায় একজন সামান্য গ্রাম্য লোকের ওরূপ সন্ধান করিলে কি হইবে?

কৃষ্ণদাস বাবু কালীর পূজা দিয়া কাশী যাইবেন, করনা ছিল। পূজা দেওয়া হইল, এক্ষণে সপরিবারে কাশী যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। আমি কাঁদিতে লাগিলাম। তিনি কহিলেন, “তুমি আমার কথা শুন। রাম রাম দত্ত নামে

আমার একজন আত্মীয় লোক ঠনঠনিয়ায় বাস করেন। কল্যাণী হাজার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, যে ‘মহাশয়, আমার পাচিকার অভাবে বড় কষ্ট হইতেছে। আপনাদিগের দেশের অনেক ডাক্তারলোকের মেয়ে পরের বাড়ী রাখিয়া খায়। আমাকে একটি দিতে পারেন?’ আমি বলিয়াছি, ‘চেষ্টা দেখিব।’ তুমি এ কার্য স্বীকার কর—নহিলে তোমার উপায় দেখি না। আমার এমন শক্তি নাই যে তোমায় আবার খরচ পত্র করিয়া কাশী লইয়া বাই। আর সেখানে গিয়াই বা তুমি কি করিবে? বরং এখানে থাকিলে তোমার খুড়ার সন্ধান করিতে পারিবে।”

অগত্যা স্বীকৃত হইতে হইল, কিন্তু রাত্রিদিন “রূপ! রূপ!” শুনিয়া আমার কিছু ভয় হইয়াছিল। পুরুষজাতি মাত্রই আমার শত্রু বলিয়া বোধ হইয়াছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,

“রাম রাম বাবুর বয়স কত?”

উ। “তিনি আমার মত প্রাচীন।”

“তঁহার স্ত্রী বর্তমান কি না?”

উ। “হুইটি।”

“অন্য পুরুষ তঁহার বাড়ীতে কে থাকে?”

উ। “তঁহার দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র অবিনাশ, বয়স দশ বৎসর। আর একটি অন্ধ ভাগিনেয়।”

আমি সন্তুষ্ট হইলাম। পর দিন কৃষ্ণদাস বাবু আমাকে রাম রাম দত্তের বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। আমি তঁহার বাড়ী পাচিকা হইয়া রহিলাম। শেষে কপালে এই ছিল! রাখিয়া থাকিতে হইল।

তৃতীয়পরিচ্ছেদ ।

প্রথমে মনে করিলাম, যে আমার বেতনের টাকা গুলি সংগ্রহ করিয়া শীঘ্রই গিজ্রালয়ে যাইতে পারিষ । কিন্তু মহেশপুর কোপায়, কেহ চিনে না—এমন লোক পাইলাম না যে কোন সুযোগ করিয়া দেয়। মহেশপুর কোন জেলা, কোন দিকে যাইতে হয়, আমি কুলবধু, এ সকলের কিছুই জানিতাম না, সুতরাং কেহ কিছু বলিতে পারিল না । এই রূপে এক বৎসর রাম রাম বাবুর বাড়ীতে কাটিল । তাহার পর একদিন অকস্মাৎ এ অন্ধকার পথে প্রদীপের আলো পড়িল, মনে হইল । শ্রাবণের রাত্রে নক্ষত্র দেখিলাম, মনে হইল ।

এই সময়ে রাম রাম দত্ত আমাকে এক দিন ডাকিয়া বলিলেন, “আজ একটি বিশিষ্ট লোককে নিমন্ত্রণ করিয়াছি—তিনি আমাৰ মহাজম, আমি খাদক,—আজিকার পাক শাক যেন পরিপাটি হয় । মহিলে বড় প্রমাদ হইবে ।”

আমি যত্ন করিয়া পাক করিলাম । আহারের স্থান অশুভপুরেই হইল—সুতরাং আমিই পরিবেশন করিতে প্রবৃত্তা হইলাম । কেবল নিমন্ত্রিত ব্যক্তি এবং রামরাম বাবু আহারে বসিলেন ।

আমি অগ্রে অন্নবাজন দিয়া আসিলাম—পরে তাঁহার আসিলেন । তাহার পর মাংস দিতে গেলাম । আমি অবগুষ্ঠন-বতী, কিন্তু ঘোমটার স্ত্রীলোকের স্বভাব ঢাকা পড়ে না । ঘোমটার ভিতর হইতে একবার নিমন্ত্রিত বাবুটিকে দেখিয়া লইলাম ।

দেখিলাম, তাঁহার বরষ ত্রিশবৎসর বোধ হয়; তিনি গৌরবর্ণ এবং মতান্তর সুপুরুষ ; তাঁহাকে দেখিয়াই রুমণীমনোহর বলিয়া বোধ হইল । বলিতে কি, আমি মাংসের পাত্র লইয়া একটু দাঁড়াইয়া রহিলাম, আর একবার তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখিলাম ।

আমি ঘোমটার তিতর হইতে তাঁহাকে খর দৃষ্টিতে দেখিতে ছিলাম, এমত সময়ে তিনি মুখ তুলিলেন—দেখিতে পাইলেন যে আমি ঘোমটার তিতর হইতে তাঁহার প্রতি তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া আছি। পুরুষে বলিয়া থাকেন, যে অন্ধকারে প্রদীপের মত, অবশুষ্ঠনমধ্যে রঙ্গীর কটাক্ষ অধিকতর তীব্র দেখায়। বোধ হয়, ইনিও সেইরূপ দেখিয়া থাকিবেন— তিনি একটু মাত্র মূহু হাসিয়া, মুখ নত করিলেন। সে হাসি কেবল আমিই দেখিতে পাইলাম। আমি সমুদায় মাংস তাঁহার পাতে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া আসিলাম।

আমি একটু লজ্জিতা, একটু স্তম্ভী হইয়া আসিলাম। লজ্জার মাথা খেয়ে বলিতে হইল—আমি নিতান্ত একটুকু স্তম্ভী হইয়া আসিলাম না! আমার নারীজন্মে প্রথম এই হাসি—আর কখন কেহ আমাকে দেখিয়া মধুর হাসি হাসে নাই। আর সকলের হাসি বিষ লাগিয়াছিল।

এতক্ষণ বোধ হয়, পতিব্রতামণ্ডলী আমার উপর ক্রভঙ্গী করিতেছেন এবং বলিতেছেন, পাগিষ্ঠে, এ যে অমুরাগ। আমি স্বীকার করিতেছি, এ অমুরাগ। কিন্তু আমি সধবা হইয়াও জন্মবিধবা। বিবাহের সময়ে একবার মাত্র স্বামিসন্দর্শন হইয়াছিল—সুতরাং যৌবনের প্রবৃত্তি সকল অপরিতুষ্ট ছিল। এমন গভীর জলে ক্ষেপণী নিক্ষেপেই যে তরঙ্গ উঠিবে, তাহাতে বিচিত্র কি ?

আমি স্বীকার করিতেছি যে এ কথা বলিয়া আমি দোষশূন্য হইতে পারিতেছি না। সकारণে হউক, আর নিকাৰণেই হউক পাপ সকল অবস্থাতেই পাপ। পাপের নৈমিত্তিকতা নাই। কিন্তু আমার জন্মের মধ্যে এই প্রথম পাপ ও এই শেষ পাপ।

পাকশালার ফিরিয়া আসিয়া আমার ঘেন মনে হইল, আমি

ঠাইকে পূর্বে কোথাও দেখিযাছি। সন্দেহভঞ্জনার্থ, আবার অন্তরাল হইতে ইহাকে দেখিতে গেলাম। বিশেষ করিয়া দেখিলাম। দেখিবা মনে মনে বলিলাম, “চিনিযাছি।”

এমন সময়ে বামবাম বাবু, আবার অন্তান্ত খাদ্য লইয়া যাইতে ডাকিয়া বলিলেন। অনেক প্রকার মাংস পাক করিয়াছিলাম—লইয়া গেলাম। দেখিলাম ইনি সেই কটাকটি মনে কবিষা বাধিয়াছেন। বামবাম দত্তকে বলিলেন, “রাম বাবু আপনার পাচিকাকে বলুন, যে পাক অতি পবিপাটি হইয়াছে।”

রামরাম ভিতরের কথা কিছু বুঝিলেন না, বলিলেন, “ইউনি রাখেন ভাল।”

আমি মনে মনে বলিলাম “তোমার মিথা মুণ্ড রাঁপি।”

নিমন্ত্রিত বাবু কহিলেন, “কিছু এ বড় আশ্চর্য্য যে আপনার বাড়ীতে জুই এক খানা বাঞ্জন আমাদের দেশের মত পাক হইয়াছে।”

আমি মনে মনে ভাবিলাম, “চিনিযাছি।” বস্তুতঃ জুই এক খানা বাঞ্জন আমাদের নিজদেশের প্রথমত পাক করিয়াছিলাম।

রামরাম বলিলেন, “তা হবে ; ওঁর বাড়ী এ দেশে নয়।”

ইনি এবার যো পাইলেন, একবারে আমার মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, “তোমাদের বাড়ী কোথায় গা ?”

আমার প্রথম সমস্যা, কথা কই কি না কই। স্থির করিলাম কথা কহিব।

দ্বিতীয় সমস্যা, সত্য বলিব না মিথ্যা বলিব। স্থির করিলাম, মিথ্যা বলিব। কেন এক্রপ স্থির করিলাম, তাহা বিনীতীলোকের হৃদয়কে চাতুর্য্যপ্রিয়, বক্রপথগামী করিয়াছেন, তাহা বিনীতীলোকের আনন্দ। আমি ভাবিলাম, “আবশ্যক হয়, সত্য

কথা বলা আমার হাতেই রহিল । এখন আব একটা বসিবা দেখ ।” এই ভাবিয়া আমি উত্তর কবিলাম,

“ আমাদেব বাড়ী কালাদীঘী ।”

তিনি চমকিয়া উঠিলেন । ক্ষণেক পরে মুহূৰ্ত্তে কহিলেন,
“ কোন্ কালাদীঘী, ডাকাতে কালাদীঘী ?”

আমি বলিলাম “ হাঁ ।”

তিনি আর কিছু বলিলেন না ।

আমি মাংসপাত্র হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম । দাঁড়াইয়া থাকা আমার যে অকর্তব্য, তাহা আমি ভুলিয়াই গিয়াছিলাম । দেখিলাম যে তিনি আর ভাল করিয়া আহাৰ করিতেছেন না । তাহা দেখিয়া রামরাম দত্ত বলিলেন,

“ উপেক্ষ বাবু, আহাৰ করুন না ।” ত্রীটি শুনিবার আমার বাকি ছিল । উপেক্ষ বাবু ! গামি নাম শুনিবার আগেই চিনিয়াছিলাম, ইনি আমার স্বামী ।

আমি পাকশালার গিয়া পাত্র ফেলিয়া একবার অনেক কালের পব আফ্লাদ করিতে বসিলাম । রামরাম দত্ত বলিলেন,
“ কি পড়িল ?” আমি মাংসের পাত্র থানা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিলাম ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

এখন হইতে এই ইতিবৃত্ত গণ্ডা এক শত বার আমার স্বামীর উল্লেখ করিবার আবশ্যক হইবে । এখন তোমরা পাঁচ জন রসিকা মেয়ে একত্র কমিটিতে বসিয়া পরামর্শ করিয়া বলিয়া দেও, আমি কোন্ শব্দ ব্যবহার করিয়া তাঁহার উল্লেখ করিব ? এক শত বার “ স্বামী স্বামী ” করিয়া কান জালাইয়া দিব ?

না আমিই বারিকের দৃষ্টান্তানুসারে, স্বামীকে “উপেক্ষ” বলিতে আরম্ভ করিব ? না, “প্রাণনাথ” “প্রাণকান্ত” “প্রাণেশ্বর” “প্রাণ পতি,” এবং “প্রাণাধিকের” ছড়া ছড়ি করিব ? যিনি আমাদের সর্বপ্রিয় সম্বোধনের পাত্র, যাহাকে পলকেই ডাকিতে ইচ্ছা করে, তাঁহাকে যে কি বলিয়া ডাকিব, এমন কথা পোড়া দেশের ভাবায় নাই। আমার এক সখী, (সে একটু সহর ঘেঁসা মেয়ে) স্বামীকে “বাবু” বলিয়া ডাকিত—কিন্তু শুধু বাবু বলিতে তাহার মিষ্ট লাগিল না—সে মনোহুঃখে স্বামীকে শেষে “বাবুরাম” বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল। আমারও ইচ্ছা করিতেছে, আমি তাই করি।

মাংসপাত্র ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, মনেই স্থির করিলাম, “যদি বিধাতা হারাধন মিলাইয়াছে—তবে ছাড়া হইবে না। বালিকার মত লজ্জা করিয়া সব নষ্ট না করি।”

এই ভাবিয়া আমি এমন স্থানে দাঁড়াইলাম যে, ভোজনস্থান হইতে বহির্কোণে গমনকালে যে এদিক্ ওদিক্ চাহিতে চাহিতে যাইবে, সে দেখিতে পাইবে। আমি মনেই বলিলাম যে, “যদি ইনি এদিক্ ওদিক্ চাহিতে না যান, তবে আমি এ কুড়ি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পুরুষের চরিত্র কিছুই বুঝি নাই।” আমি স্পষ্ট কথা বলি, তোমরা আমাকে মার্জনা করিও—আমি মাথার কাপড় ফেলিয়া দিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। এখন লিখিতে লজ্জা করিতেছে, কিন্তু তখন আমার কি দায়, তাহা মনে করিয়া দেখ।

অগ্রেই রামরাম দত্ত গেলেন—তিনি কোন দিকে চাহিলেন না। তার পর স্বামী গেলেন—তাঁহার চক্ষু যেন চারিদিকে কাহার অহুসন্ধান করিতেছিল। আমি তাঁহার নয়নপথে পড়িলাম। তাঁহার চক্ষু আমারই অহুসন্ধান করিতেছিল, তাহা

বিভ্রাণ জ্ঞানিতাম। তিনি আমার প্রতি চাহিবামাত্র, আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক,—কি বলিব, বলিতে লজ্জা করিতেছে—সর্পের যেমন চক্রবিন্দুর স্বভাবসিদ্ধ, কটাক্ষও আমাদিগের তাই। তাহাকে আপনার স্বামী বলিয়া জ্ঞানিয়াছিলাম, তাহার উপর একটু অধিক করিয়া বিষ ঢালিয়া না দিব কেন? বোধ হয় “প্রাণনাথ” আহত হইয়া বাহিরে গেলেন।

হারাণী নামে রামরাম দস্তের একজন পরিচারিকা ছিল। আমার সঙ্গে তাহার বড় ভাব—সেও দাসী, আমিও দাসী—না হইবে কেন? আমি তাহাকে বলিলাম, “বি, আমার জন্মের শোধ একবার উপকার কর। ঐ বাবুট কখন যাইবেন, আমাকে শীঘ্র খবর আনিয়া দে।”

হারাণী মুহূ হাসিল। বলিল, “ছি! দিদি ঠাকুরন! তোমার এ রোগ আছে, তা জানিতাম না।”

আমিও হাসিলাম। বলিলাম, “মাহুষের সকল দিন সমান যায় না। এখন তুই গুরুমহাশয় গিরি রাখ—আমার এ উপকার করবি কি না বল।”

হারাণী বলিল, “তোমার জন্য এ কাজ আমি করিব কিন্তু আর কারও জন্য হইলে করিতাম না।”

হারাণীর নীতিশিক্ষা এই রূপ।

হারাণী স্বীকৃত হইরা গেল, কিন্তু ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হইতে লাগিল। ততক্ষণ আমি কাটা মাছের মত ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলাম। চারি দণ্ড পরে হারাণী ফিরিয়া আসিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, “বাবুর অমুখ করিয়াছে—বাবু এ বেলা যাইতে পারিলেন না—আমি তাহার বিছানা লইতে আসিয়াছি।”

আমি বলিলাম, “কি জানি, যদি অপরাহ্নে চলিয়া যান—তুই একটু নিৰ্জ্জন পাইলেই তাহাকে বলিঙ্গ যে আমাদের

রাধুনী ঠাকুরানী বলিয়া পাঠাইলেন যে, “এ বেলা আপনার খাওয়া ভাল হয় না, রাত্রি থাকিয়া খাইয়া যাইবেন।” কিন্তু রাধুনীর মিস্ত্রণ, কাহারও সাফাতে প্রকাশ করিবেন না। কোন ছল করিয়া থাকিবেন।” হারানী আবার হাসিয়া বলিল, “ছি!” কিন্তু দোস্ত স্বীকৃতা হইয়া গেল। হারানী অপরাহ্নে আসিয়া আমাকে বলিল, “তুমি যাহা বলিয়াছিলে, তাহা বলিয়াছি। বাবুটি ভাল মানুষ নহেন—রাজি হইয়াছেন।”

শুনিয়া আশ্চর্যিত হইলাম, কিন্তু মনেং তাঁহাকে একটু নিন্দা করিলাম। আমি চিনিয়াছিলাম যে তিনি আমার স্বামী, এই জন্য যাহা করিতেছিলাম, তাহাতে আমার বিবেচনার দোষ ছিল না। কিন্তু তিনি যে আমাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন, এমনত কোন মতেই সম্ভবে না। আমি তাঁহাকে বয়ঃপ্রাপ্ত জ্ববস্তায় দেখিয়াছিলাম—এজন্য আমার প্রথমেই সন্দেহ হইয়াছিল। তিনি আমাকে একাদশ বৎসরের বালিকা দেখিয়াছিলেন মাত্র। তিনি আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন, এমন কোন লক্ষণও দেখি নাই। অতএব তিনি আমাকে পরজ্জী জানিয়া যে আমার প্রণয়শায় লুপ্ত হইলেন, শুনিয়া মনেং নিন্দা করিলাম। কিন্তু তিনি স্বামী, আমি স্ত্রী—তাঁহার মন্দ ভাবা আমার অকর্তব্য বলিয়া সে কথার আর আলোচনা করিলাম না। মনেং সঙ্কল্প করিলাম, যদি কখন দিন পাই তবে এ স্বভাব ত্যাগ করাইব।

অবস্থিতি করিবার জন্য তাঁহাকে ছল খুঁজিয়া বেড়াইতে হইল না। তিনি কলিকাতায় কারবার আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেই জন্য মধ্যে২ কলিকাতায় আসিতেন। সময়সম মতের সঙ্গে তাঁহার দেখা পাওনা ছিল। সেই স্ত্রেই তাঁহার সঙ্গে লুপ্ত স্বামীত্ব। অপরাহ্নে তিনি হারানীর কথায় স্বীকৃত

ছটপ্পা, বামবায়ের সঙ্গে পুনশ্চ সাক্ষাৎ হইলে বলিলেন, “ যদি আসিয়াছি, তবে একবাব হিসাবটা দেখিগা গেলে ভাল হইত। ”
 বামবায় বাবু বলিলেন, “ ক্ষতি কি ? কিছু কাগজ পত্র সব আডতে আছে, আনিতে পাঠাই। আসিতে রাজি হইবে। যদি অক্ষুণ্ণ কবিতা কাল প্রাতে একবাব পদার্থ করেন—কিছা অদ্য অবস্থিতি কবেন, তবেই হইতে পাবে। ” তিনি উত্তর কবিশন, “ তাতার বিচিত্র কি ? এ আমায়ই ঘর। একবাবে কাল প্রাতেই বাইব। ”

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

গভীর রাত্রে সকলে আহা়ারান্তে শয়ন করিলে পর, আমি নিঃশব্দে রামরাম দত্তের বৈঠকখানায় গেলাম। তথায় আমার স্বামী একাকী শয়ন করিয়াছিলেন।

যৌবনপ্রাপ্তির পর আমার এই প্রথম স্বামিসন্তাষণ। সে যে কি মুখ, তাহা কেমন করিয়া বলিব ? আমি অত্যন্ত মুখরা—কিন্তু যখন প্রথম তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতে গেলাম, কিছুতেই কথা ফুটিল না। কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতে লাগিল। সর্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। জদয়মধ্যে গুরুতর শব্দ হইতে লাগিল। রসনা শুকাইতে লাগিল। কথা আসিল না বলিয়া আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম।

সে অশ্রুজল তিনি বুঝিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, “ কাঁদিলে কেন ? আমি ত তোমাকে ডাকি নাই—তুমি আপনি আসিয়াছ—তবে কাঁদ কেন ? ”

এই নিদারুণ বাক্যে বড় মর্শ্মপীড়া হইল, তিনি যে আমাকে কুলটা মনে করিতেছেন—ইহাতে চক্ষের প্রবাহ আরও বাড়িল।

মনে কবিলাম, এখন পরিচয় দিই—এ যত্ননা আর সহ্য হয় না। কিন্তু তখনই মনে হইল যে, পরিচয় দিলে যদি ঠনি না বিশ্বাস কবেন—যদি মনে কবেন সে, “ইঁহাব বাড়ী কালাদীঘী, অবশ্য আমার স্ত্রীহরণেব বৃত্তান্ত শুনিয়াছে, এক্ষণে ঐশ্বর্য লোভে আমার স্ত্রী বলিয়া মিথ্যা পরিচয় দিতেছে”—তাহা হইলে কি প্রকারে ইহার বিশ্বাস জন্মাইব? সুতরাং পরিচয় দিলাম না। দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, চক্কর জল মুছিয়া, তাঁহার সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলাম। অন্তান্ত কথার পরে তিনি বলিলেন, “কালাদীঘী তোমার বাড়ী শুনিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি। কালাদীঘীতে যে এমন সুন্দরী জন্মিয়াছে, তাহা আমি স্বপ্নেও জ্ঞানিতাম না। আমরাদিগের দেশে যে এমন সুন্দরী জন্মিয়াছে, তাহা এখনও আমার বিশ্বাস হইতেছে না।”

আমি মেকী সাজিয়া বলিলাম, “আমি সুন্দরী না বান্দরী। আমাদের দেশের মধ্যে আপনার স্ত্রীরই সৌন্দর্যের গৌরব।” এই চলক্রমে তাঁহার স্ত্রীর কথা পাড়িয়াই জিজ্ঞাসা করিলাম, “তাঁহার কি কোন সন্ধান পাওয়া গিয়াছে?”

উত্তর। না।—তুমি কত দিন দেশ হইতে আসিয়াছ?

আমি বলিলাম, “আমি সে সকল ব্যাপারের পরেই দেশ হইতে আসিয়াছি। তবে বোধ হয়, আপনি আবার বিবাহ করিয়াছেন।”

উত্তর। না।

সপত্নী হয় নাই, শুনিয়া বড় আশ্চর্য্য হইল। বলিলাম, “আপনারা যেমন বড় লোক, এটি তেমনি বিবেচনার কাজ হইয়াছে। নহিলে যদি এর পরে আপনার স্ত্রীকে পাওয়া যায়, তবে ছই সতীনে ঠেকাঠেকি বাধিবে।”

তিনি মুহূর্ৎ ইন্দিরা বলিলেন, “নে ভয় নাই। সে স্ত্রীকে

পাইলেও আমি আর গ্রহণ করিব, এমনত বোধ হব না। তাহার আর জাতি নাই, বিবেচনা করিতে হইবে।”

আমার মাথায় বজ্রাঘাত হইল। এত আশা ভরসা সব নষ্ট হইল। তবে আমার পরিচয় পাইলে, আমাকে আপন স্ত্রী বলিয়া চিনিলেও, আমাকে গ্রহণ করিবেন না! আমার এবাবকার নাবীজন্ম ব্রথায় হইল।

সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা কবিলাম, “যদি এখন তাঁহার দেখা পান, তবে কি করিবেন?”

তিনি অস্বাভাবিক বলিলেন, “তাকে ত্যাগ করিব।”

কি নির্দয়! আমি স্তম্ভিতা হইয়া রহিলাম। পৃথিবী আমার চক্ষে ঘুরিতে লাগিল।

সেই রাত্রে আমি স্বামি-শয্যা বসিয়া তাঁহার অনিন্দিত মোহনমূর্ত্তি দেখিতে২ প্রতিজ্ঞা করিলাম, “ইনি আমার স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ কবিবেন, নচেৎ আমি প্রাণত্যাগ করিব।”

যষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

ওখন সে চিন্তিতভাবে আমার দৃব হইল। ইতিপূর্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম, যে তিনি আমার হাস্য কটাক্ষের বশীভূত হইয়াছেন। মনে২ করিলাম, যদি গণ্ডাবেব খজ্ঞাপ্রয়োগে পাপ না থাকে, যদি হস্ত্যেব দত্তপ্রয়োগে পাপ না থাকে, যদি ব্যাঘ্রবেব নখ্যাবেগাবে পাপ না থাকে, যদি মহিষের শৃঙ্গাঘাতে পাপ না থাকে, তবে আমারও পাপ হইবে না। জগদীশ্বর আমাদিগকে যে সকল আস্থ দিয়াছেন, উত্তরের যত্নার্থে তাহা প্রয়োগ করিব। আমি তাঁহার নিকট হইতে হুবে আমিরা বসিলাম। তাঁহার সঙ্গে প্রফুল্ল হইয়া কথা কহিতে লাগিলাম।

তিনি নিকটে আসিলেন, আমি তাঁহাকে কহিলাম, “আমার নিকটে আসিবেন না। আপনার একটি ভ্রম জন্মিয়াছে দেখিতেছি,” হাসিতেই আমি এই কথা বলিলাম এবং বলিতেই কবরীমোর্চন পূর্বক (সত্য কথা না বলিলে কে এ ইতিহাস বুঝিতে পারিবে?) আবার বাধিতে বলিলাম, “আপনার একটি ভ্রম জন্মিয়াছে! আমি কুলটা নহি। আপনার নিকটে দেশের সম্বাদ শুনিব বলিরাই আসিয়াছি। অসৎ অভিপ্রায় কিছুই নাই।”

বোধ হয়, তিনি এ কথা বিশ্বাস করিলেন না। অগ্রসর হইয়া বলিলেন। আমি তখন হাসিতেই বলিলাম, “তুমি কথা শুনিলে না, তবে আমি চলিলাম। তোমার সঙ্গে এই সাক্ষাৎ,” এই বলিয়া আমি গাত্রোথান করিলাম।

আমি সত্য সত্যই গাত্রোথান করিলাম দেখিয়া তিনি ক্ষুধ হইলেন; আসিয়া আমার হস্ত ধরিলেন। আমি রাগ করিয়া হাত ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলাম, কিন্তু হাসিলাম, বলিলাম, “তুমি ভাল মানুষ নও। আমাকে ছুঁইও না। আমাকে হৃৎচরিত্রা মনে করিও না।”

এই বলিয়া আমি দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলাম। স্বামী—অদ্যাপি সে কথা মনে পড়িলে দুঃখ হয়—তিনি হাত ঘোড় করিয়া ডাকিলেন, “আমাকে রক্ষা কর, রক্ষা কর, যাইও না। আমি তোমার রূপ দেখিয়া পাগল হইয়াছি। এমন রূপ আমি কখন দেখি নাই।” আমি আবার ফিরিলাম—কিন্তু বলিলাম না—বলিলাম, “প্রাণাধিক! আমি কোন ছার, আমি যে তোমা হেন রত্ন ত্যাগ করিয়া যাইতেছি, ইহাতেই আমার মনের দুঃখ বৃদ্ধি পায়। কিছু কি করিব? ধর্মই আমাদিগের এক মাত্র প্রধান

খন—একদিনের সুখের জন্য আমি ধর্ম ত্যাগ করিব না । আমি চলিলাম ।”

তিনি বলিলেন, “ আমি শপথ করিয়াছি, তুমি চিরকাল আমার হৃদয়েধরী হইয়া থাকিবে । এক দিনের জন্য কেন ?”

আমি হাসিয়া বলিলাম, “ পুরুষের শপথে বিশ্বাস নাই ।” এই বলিয়া আবার চলিলাম—দ্বার পর্য্যন্ত আসিলাম । তখন আব ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে না পারিয়া তিনি ছুই হস্তে আমার ছুই চরণ ধরিয়া পঙ্করোধ করিলেন ।

তাঁহার দশা দেখিয়া আমার হৃৎক হইল । বলিলাম, “তবে তোমার বাসায় চল—এখানে থাকিলে তুমি আমার ত্যাগ কবিয়া গাইবে ।”

তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন । তাঁহার বাসা সিমলায়, অন্নদুব, সেই বাগেই আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন । সেখানে গিয়া দেখিলাম, ছুই মহল বাড়ী । একটি ঘবে আমি অগ্রে প্রবেশ করিলাম । প্রবেশ করিয়াই ভিতর হইতে দ্বার কন্ধ কবিলাম । স্বামী বাহিরে পড়িয়া রহিলেন ।

তিনি বাহির হইতে কাতরোক্তি করিতে লাগিলেন । আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম, “ আমি এখন তোমারই দাসী হইলাম । কিন্তু দেখি তোমার প্রণয়ের বেগ কাল প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত থাকে না থাকে । যদি কালও এমনি ভালবাসা দেখিতে পাই, তখন তোমার সঙ্গে আবার আলাপ করিব । আজ এই পর্য্যন্ত ।”

আমি দ্বার খুলিলাম না । অগত্যা তিনি অন্যত্র গিয়া বিশ্রাম করিলেন । অনেক বেলা হইলে দ্বার খুলিলাম । দেখিলাম, স্বামী দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছেন । আমি আপনার করে তাঁহার করগ্রহণ করিয়া বলিলাম, “ প্রাণনাথ, হুই আমাকে

বামনাম দস্তের দাড়ী পাঠাইয়া দাও, নচেৎ অষ্টাচ আমার সঙ্গে আলাপ করিও না। এই অষ্টাহ তোমার শব্দীকা।” তিনি অষ্টাহ পরীক্ষা স্বীকার করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

পুরুষকে দগ্ন কবিবার যে কোন উপায় বিদ্যাতা স্ত্রীলোককে দিবাছেন, সেই সকল উপায়ই অবলম্বন করিয়া আমি অষ্টাহ স্বামীকে জ্ঞানাতন করিলাম। আমি স্ত্রীলোক—কেমন কবিয়া মুখ ফুটিয়া সে সকল কথা বলিব। আমি যদি আগুন জালিতে না জানিতাম, তবে গত রাজে এত আগুন জ্বলিত না। কিন্তু কি প্রকারে আগুন জ্বালিলাম—কি প্রকারে দুঃকাষ দিলাম—কি প্রকারে স্বামীকে দগ্ন করিলাম, লজ্জার তাহার কিছুই বলিতে পারি নাট। যদি আমার কোন পাঠিকা নরহন্যাব ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং সফল হইয়া থাকেন, তবেই তিনিট বৃদ্ধিবেন। যদি কোন পাঠিক কখন এইরূপ নবঘাতিনী ব্রহ্মে পড়িয়া থাকেন, তিনিট বৃদ্ধিবেন। বলিও কি স্ত্রীলোকট পৃথিবীর কষ্টক। আমারে ব্রাহ্মি হইতে পৃথিবীর ব্রত অনিষ্ট ঘটে, পুরুষ হইতে ভ্রত ঘটে না। সৌভাগ্য এই যে এত নবঘাতিনী বিদ্যা সকল স্ত্রীলোকে জানে না, তাহা হইলে এত দিনে পৃথিবীতে আগুন লাগিত।

এই অষ্টাহ আমি সর্বদা স্বামীর কাছে কাছে থাকিতাম—আদর করিয়া কথা কহিতাম—নীরস কথা একটি কহিতাম না। কানি, চাহনী, অন্নভক্ষী,—সে সকল ভ ইতর স্ত্রীলোকের অন্ন। আমি প্রথম দিনে আদর কবিয়া কথা কহিলাম—দ্বিতীয় দিনে অন্নরাগ লক্ষণ দেখাইলাম—তৃতীয় দিনে তাহার ঘনকরনার

কাজ করিতে আরম্ভ করিলাম; যাহাতে তাঁহার আহারের পারিপাট্য, শরনের পারিপাট্য, স্থানের পারিপাট্য হয়, সর্ব্বাংশে যাহাতে ভাল থাকেন, তাহাই করিতে আরম্ভ করিলাম—
 স্বহস্তে পাক করিলাম; খড়িকাটি পর্য্যন্ত স্বয়ং প্রস্তুত করিয়া রাখিলাম। লজ্জার কথা কহিব কি?—এক দিন একটু কাঁদিলাম; কেন কাঁদিলাম, তাহা স্পষ্ট তাঁহাকে জানিতে দিলাম না—অণুচ একটুই বৃষ্টিতে দিলাম যে অষ্টাহ পরে পাছে বিচ্ছেদ হয়—পাছে তাঁহার অধুরাগ স্থায়ী না হয়, এই আশঙ্কার কাঁদিতেছি। এক দিন, তাঁহার একটু অসুখ হইয়াছিল, সমস্ত বাঁধি জাগরণ করিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিলাম। এ সকল পাপাচরণ শুনিয়া আমাকে স্নগা কবিও না—আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে সকলই কৃত্রিম নহে—আমি তাঁহাকে আশ্চরিক ভাল বাসিতে আবৃত্ত করিয়াছিলাম। তিনি যে পরিমাণে আমার প্রতি অনুবাগী, তাহার অধিক আমি তাঁহাব প্রতি অধুরাগিনী হইয়াছিলাম। বলা বাহুল্য যে তিনি অষ্টাহ পরে আনন্দে নাচিয়া হাডাইয়া দিলেও আমি যাইতাম না।

ইহাও বলা বাহুল্য যে তাঁহার অধুরাগানলে অপরিমিত ব্রতচরিত্রি পড়িতেছিল। তিনি এখন অনন্যাকর্ষী হইয়া কেবল আমার মুখপানে চাভিয়া থাকিতেন। আমি গৃহকর্ম্ম করিতাম—তিনি বালকের মত আমার সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতেন। তাঁহার চিন্তের ছন্দমনীর বেগ প্রতিপদে দেখিতে পাইতাম, অণুচ আমার ঈকান্তমাত্রের স্থিতি হইতেন। কখন কখন আমার চরণস্পর্শ করিয়া রোদন করিতেন, বলিতেন, “আমি এ অষ্টাহ তোমার কথা পালন করিব—তুমি আমার ত্যাগ করিয়া যাইও না।” ফলে আমি দেখিলাম যে আমি তাঁহাকে ত্যাগ করিলে তাঁহার উন্মাদগ্রস্ত হওয়া অসম্ভব নহে।

পরীকার শেষ দিন আমিও তাঁহার সঙ্গে কাটলাম। বলিলাম, “আশাশুঙ্ক! আমি তোমার সঙ্গে আসিরা ভাল করি নাই। তোমাকে বুঝা কষ্ট দিলাম। এখন আমার বিবেচনা হইতেছে, পরীক্ষা মিথ্যা ভ্রম মাত্র। মাতুষের মন স্থির নয়। তুমি আট দিন আমাকে ভাল বুঝিলে—কিন্তু আট মাস পরে তোমার এ ভালবাসা থাকিবে কি না, তাহা তুমিও বলিতে পার না। তুমি আমার ত্যাগ করিলে আমার কি দশা হইবে?”

তিনি হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, “তোমার যদি সেই ভালবাসা হয়, তবে আমি তোমাকে এখনই যাবজ্জীবনের উপায় করিয়া দিতেছি। পূর্বেই আমি মনে করিয়াছি, তোমার যাবজ্জীবনের সংস্থান করিয়া দিব।”

আমিও ঐ কথাই পাড়িবার উদ্যোগ করিতেছিলাম; তিনি আপনি পাড়ায় আরও ভাল হইল। আমি তখন বলিলাম, “ছি! তুমি যদি ত্যাগ করিলে তবে আমি টাকা লইয়া কি করিব? ভিক্ষা করিয়া খাইলেও জীবনরক্ষা হয়, কিন্তু তুমি ত্যাগ করিলে জীবনরক্ষা হইবে না। তুমি এমন কোন কাজ কর, যাহাতে আমার বিশ্বাস হয় যে তুমি এজন্মে আমায় ত্যাগ করিবে না। আজ শেষ পরীকার দিন।”

তিনি বলিলেন, “কি করিব, বল। তুমি যাহা বলিবে, তাহাই করিব।”

আমি বলিলাম, “আমি স্ত্রীলোক, কি বলিব? তুমি আপনি বুঝিয়া কর।” পরে অন্য কথা পাড়িলাম। কথায়২ একটা মিথ্যা সঙ্গ করিলাম। তাহাতে কোন ব্যক্তি আশ্রম উপপন্থীকে সমুদায় সম্পত্তি লিখিয়া দিয়াছিল—এই প্রসঙ্গ ছিল।

তিনি গাড়ি প্রস্তুত করিতে বলিলেন। গাড়ি প্রস্তুত হইলে বসিবার গেলেন। আট দিনের মধ্যে এই তিনি প্রথমে আমার

কাছ ছাড়া হইলেন। কণেক পরে ফিরিয়া আসিলেন। কোথায় গিয়াছিলেন, তাহা আমাকে কিছু বলিলেন না। আমিও কিছু জিজ্ঞাসা করিলাম না। অপরহাফে আবার গেলেন। এবার একখানি কাগজ হাতে করিয়া আসিলেন। বলিলেন, “উহা লও। তোমাকে আমার সমস্ত সম্পত্তি লিখিয়া দিলাম। উকীলের বাড়ী হইতে এই দানপত্র লেখাইয়া আনিয়াছি। যদি তোমাকে আগি কখন ত্যাগ করি, তবে আমাকে ভিক্ষা করিয়া থাইতে হইবে।”

এবার আমার অকৃত্রিম অশ্রুজল পড়িল—তিনি আমাকে এত ভাল বাসেন! আমি তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া বলিলাম, “আগি হটুক আমি তোমার চিরকালের দাসী হইলাম। পরীক্ষা শেষ হইয়াছে।”

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

তাঁহার পরেই মনেঃ বলিলাম, “এইবার সোণার টাঁদ, আর কোথায় যাইবে? তবে নাকি আমাকে গ্রহণ করিবে না?” যে অভিপ্রায়ে, আমার এত ভাল পাতা, তাহা সিদ্ধ হইল। এখন আমি তাঁহার স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিলে, তিনি যদি গ্রহণ না করেন, তবে তাঁহাকে সর্বভ্যাগী হইতে হইবে।

আমার পিতা নাম রাখিয়াছিলেন “ইন্দিরা”—মাতা নাম রাখিয়াছিলেন “কুমুদিনী।” যন্ত্রর বাড়ীতে ইন্দিরা নামই জানিত, কিন্তু পিত্রালয়ে অনেকেই আমাকে কুমুদিনী বলিত। রাম রাম কব্জের বাড়ীতে আমি কুমুদিনী নাম ভিন্ন ইন্দিরা নাম বলি নাই। ইহাঁর কাছে আমি কুমুদিনী ভিন্ন ইন্দিরা নাম প্রকাশ করি নাই। কুমুদিনী নামেই লেখা পড়া হইয়াছিল।

কিছু দিন আমরা কলিকাতার স্লুথে সঙ্কল্পে রহিলাম। আমি এপর্যন্ত পরিচয় দিলাম না। ইচ্ছা ছিল, একেবারে মহেশপুরে গিয়া পরিচয় দিব। ভলে কৌশলে স্বামীর নিকট হইতে মহেশপুরের সম্বাদ সকল জানিয়াছিলাম—সকলে কুশলে ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের দেখিবার জন্য বড় মন ব্যস্ত হইয়াছিল।

আমি স্বামীকে বলিলাম, “আমি একবার কালাদীঘী ঘাটবা পিতামাতাকে দেখিয়া আসিব। আমাকে পাঠাইয়া দাও।”

স্বামী ইহাতে নিতান্ত অনিচ্ছুক। আমাকে ছাড়িয়া দিবা কি প্রকারে থাকিবেন? কিন্তু এদিকে আমার আজ্ঞাকারী, “না” বলিতে পারিলেন না। বলিলেন, “কালাদীঘী ঘাটে আসিতে এখন হইতে পনের দিনের পথ; এতদিন তোমাকে না দেখিতে পাইলে আমি মরিয়া যাইব। আমি তোমার সঙ্গে যাইব।”

আমি বলিলাম, “আমিও তাই চাই। কিন্তু তুমি কালাদীঘী গিয়া কোথায় থাকিবে?”

তিনি চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কালাদীঘীতে কতদিন থাকিবে?”

আমি বলিলাম, “তোমাকে যদি না দেখিতে পাই, তবে পাঁচদিনের বেশী থাকিব না।”

তিনি বলিলেন, “সেই পাঁচদিন আমি বাড়ীতে থাকিব। পাঁচদিনের পর তোমাকে কালাদীঘী হইতে লইয়া আসিব।”

এইরূপ কথা বার্তা হইলে পর আমবা যথাকাল উভয় শ্রমিকায়োগে কলিকাতা হইতে যাত্রা কবিলাম। তিনি আমাকে কালাদীঘী নামক সেই হস্তভাগ্য দীঘী পাব বধিরা গ্রামের মধ্য পর্য্যন্ত পহুছাইয়া দিয়া নিজালয় অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

তিনি পশ্চাৎ কিরিলে, আমি বাহকদিগকে বলিলাম, “আমি আগে মহেশপুর যাইব—তাহার পর কালানীঘী আসিব। তোমরা আমাকে মহেশপুর লইয়া চল। যথেষ্ট পুরস্কার দিব।”

তাহারা আমাকে মহেশপুর লইয়া গেল। গ্রামের বাহিরে বাহক ও রক্ষকদিগকে অবস্থিতি করিতে বলিয়া দিয়া আমি পদব্রজে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। পিতাব গৃহ সম্মুখে দেখিয়া, এক নির্জন স্থানে বসিয়া অনেক রোদন করিলাম। তাহার পর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলাম। সম্মুখেই পিতাকে দেখিয়া প্রথম কবিলাম। তিনি আমাকে চিমিতে পারিয়া আচ্ছাদে বিবশ হইলেন। সে সকল কথা এখানে বলিবার অর্থ সব নাই।

আমি এত দিন কোথায় ছিলাম, কি প্রকাবে আসিলাম—তাহা কিছুই বলিলাম না। পিতা মাতা সিজ্ঞাসা করিলে বলিলাম, “এর পবে বলিব।”

পর দিন পিতা আমাব শ্বশুর বাড়ী লোক পাঠাইলেন। পত্রবাহককে বলিয়া দিলেন, “জামাতা যদি বাড়ী না থাকেন, তবে যেখানে থাকেন, সেইখানে গিয়া এই পত্র দিয়া আসিবি।”

আমি মাতাকে বলিলাম, “আমি আসিয়াছি, এ কথা তাঁচাকে জানাইও না। আমি এতদিন যরে ছিলাম না, কি জানি, তিনি যদি গ্রহণ কবিত্তে অনিচ্ছুক হন, তবে আসিবেন না। অন্য কোন ছলে এখানে তাঁহাকে আনাও। তিনি এখানে আসিলে আমি সন্দেহ মিটাইব।”

মাতা এ কথা পিতাকে বলিলে তিনি সম্মত হইলেন। পত্রে লিখিলেন, “আমি উইল করিব। তুমি আমার জামাতা এবং পরমাত্মীয়, আর সন্নিবেচক। অতএব তোমার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া উইল করিব। তুমি পত্র পাঠ এখানে আসিবে।”

তিনি পত্র পাঠ আসিলেন। তিনি এখানে আসিলে পিতা তাঁহাকে যথার্থ কথা জানাইলেন।

শুনিয়া স্বামী মোনাবলঘন করিলেন। পরে বলিলেন, “আপনি পূজ্য ব্যক্তি। যে ছলেই হউক, এখানে আসিয়া যে আপনার দর্শনলাভ করিলাম, ইহাই যথেষ্ট। কিন্তু আপনার কন্যা এতদিন গৃহে ছিলেন না—কোথায় কি চরিত্রে কাহার গৃহে ছিলেন, তাহা কেহ জানে না। অতএব তাঁহাকে আমি গ্রহণ করিব না।”

পিতা মর্শ্বাস্তিক পীড়িত হইলেন। এ কথা মাতাকে বলিলেন, মা আমাকে বলিলেন। আমি সমবয়স্কাদিগকে বলিলাম, “তোমরা উর্হাদিগকে চিন্তা করিতে মানা কর। তাঁকে একবার অস্তঃপুরে আন—তাহা হইলেই আমি উর্হাকে গ্রহণ করাইব।”

কিন্তু অস্তঃপুরে আসিতে স্বামী কোন মতেই স্বীকৃত হইলেন না। বলিলেন, “আমি যে স্ত্রীকে গ্রহণ করিব না, তাহাকে সম্ভাষণও করিব না।” শেষে মাতার রোদন এবং আমার সমবয়স্কাদিগের ব্যক্তির আলায় সন্ধ্যার পর অস্তঃপুরে জল খাইতে আসিলেন।

তিনি জলযোগ করিতে আসনে বসিলেন। কেহ তাঁহার নিকটে দাঁড়াইল না—সকলেই সরিয়া গেল। তিনি অন্যমনে, মুখ নত করিয়া, আহার করিতেছিলেন, এমন সময়ে আমি নিঃশব্দে তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার চক্ষু টিপিয়া ধরিলাম। তিনি হাসিতে বলিলেন,

“হাঁ দেখ, কামিনি, তুই আজও কি কচি খুকী যে আমার ঘাড়ের উপর পড়িল ?”

কামিনী আমার কনিষ্ঠা ভগিনীর নাম।

আমি বলিলাম, “আমি কামিনী নই, কে বল, তবে ছাড়িব।”

আমার কণ্ঠ স্বর শুনিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন,
“এ কি এ?”

আমি তাঁহার চক্ষু ছাড়িয়া সম্মুখে দাঁড়াইলাম। বলিলাম,
“চতুর চুড়াগুণি! আমার নাম ইন্দিরা—আমি হয়মোহন দত্তের
কন্যা, এই বাড়ীতে থাকি। আপনাকে প্রাতঃপ্রণাম—আপ-
নার কুমুদিনীর মঙ্গল ত?”

তিনি অবাক হইলেন। আমাকে দেখিয়াই যে তাঁহার
আচ্ছাদ হইল, তাহা বুঝিতে পারিলাম। বলিলেন, “এ আবার
কোন রঙ্গ কুমুদিনী? তুমি এখানে কোথা হইতে?”

আমি বলিলাম, “কুমুদিনী আমার আর একটি নাম।
তুমি বড় গোবর গণেশ, তাই এত দিন আমাকে চিনিতে পার
নাই। কিন্তু তোমাকে যখন রাম রাম দত্তের বাড়ী ভোজন
করিতে দেখিয়াছিলাম, আমি তখনই তোমাকে চিনিয়াছিলাম।
নচেৎ সে দিন তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতাম না। প্রাণাধিক
—আমি কুলটা নহি।”

তিনি একটু আশ্চর্যবিশ্বস্তের মত হইলেন। পরে সজ্জামা
করিলেন, “তবে এতদিন এত ছলনা করিয়াছিলে কেন?”

আমি বলিলাম, “তুমি প্রথম সাক্ষাতের দিনে বলিয়াছিলে
যে তোমার স্ত্রীকে পাইলেও গ্রহণ করিবে না। নচেৎ সেই
দিনেই পরিচয় দিতাম।” দানপত্রখানি আমার অঞ্চলে বাধিয়া
আনিয়াছিলাম। তাহা খুলিয়া দেখাইয়া বলিলাম “সেই
রাত্রেই আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে হয় তুমি আমার গ্রহণ
করিবে, নচেৎ আমি প্রাণত্যাগ করিব। সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষার
জন্যই এই খানি লেখাইয়া লইয়াছি। কিন্তু ইহা আমি ভাল
করি নাই। তোমার সঙ্গে শঠতা করিয়াছি। তোমার অতি-
কৃতি হয়, আমার গ্রহণ কর; না অতিকৃতি হয়, আমি তোমার

উঠান কাঁটি দিয়া খাইব—তাহা হইলেও তোমাকে দেখিতে
পাইব, দান পত্র আমি এই নষ্ট করিলাম ।”

এই বলিয়া সেই দানপত্র তাঁহার সম্মুখে খণ্ড করিয়া ছিন্ন
করিলাম ।

তিনি গাত্রোখান করিয়া—আমাকে আলিঙ্গন করিলেন ।
বলিলেন, “ তুমি আমার সৰ্ব্বস্ব । তোমায় ত্যাগ করিলে আমি
প্রাণে মরিব । তুমি আমার গৃহে গৃহিণী হইবে চল ।”

সম্পূর্ণ ।

ସୁଗଳାଦୁରୀୟ ।

যুগলাঙ্গুরীয় ।

—০০০—

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

দুইজনে উদ্যানমধ্যে লতামণ্ডপতলে দাঁড়াইয়াছিলেন ।
তখন প্রাচীন নগরী তাম্রলিপ্তির* চরণ ধৌত করিয়া অনন্ত
নীল সমুদ্র মৃদু মৃদু গিনাদ করিতেছিল ।

তাম্রলিপ্তি নগরীর প্রান্তভাগে, সমুদ্রতীরে এক বিচিত্র
অট্টালিকা ছিল । তাহার নিকট একটি স্মৃনির্মিত বৃক্ষবাটিকা ।
বৃক্ষবাটিকার অপিকারী ধনদাস নামক একজন শ্রেষ্ঠী । শ্রেষ্ঠীর
কন্যা হিরণ্ময়ী লতামণ্ডপে দাঁড়াইয়া এক যুবা পুরুষের সঙ্গে
কথা কহিতেছিলেন ।

হিরণ্ময়ী বিবাহের বয়স অতিক্রম করিয়াছিলেন । তিনি
ইঙ্গিত স্বামীর কামনায় একাদশ বৎসরে আরম্ভ করিয়া ক্রমাগত
পঞ্চবৎসর, এই সমুদ্রতীরবাসিনী সাগরেশ্বরী নামী দেবীর পূজা
করিয়াছিলেন, কিন্তু মনোরথ সফল হয় নাই । প্রাপ্তযৌবনা
কুমারী কেন যে এই যুবার সঙ্গে একাকিনী কথা কহেন, তাহা
সকলেই জানিত । হিরণ্ময়ী যখন চারি বৎসরের বালিকা,

* আধুনিক তামলুক । পুরাবৃত্তে পাওয়া যায় যে পূর্বকালে
এই নগরী সমুদ্রতীরবর্তিনী ছিল ।

তখন এই যুবার বয়ঃক্রম আটবৎসর। ইহার পিতা শচীশূত্র শ্রেণী ধনদাসের প্রতিবাসী, এজন্য উভয়ে একত্র বালাক্রীড়া করিতেন। হয় শচীশূত্রের গৃহে, নয় ধনদাসের গৃহে, সর্বদা একত্রে স্হাশন করিতেন। এক্ষণে যুবতীর বয়স বোড়শ, যুবার বয়স বিংশতি বৎসর, তথাপি উভয়ের সেই বালসখিত্ব সম্বন্ধই ছিল। একটু মাত্র বিয় ঘটিয়াছিল। বথাকালে উভয়ের পিতা, এই যুবক যুবতীর পরস্পরের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধ করিয়াছিলেন। বিবাহের দিনস্থির পর্য্যন্ত হইয়াছিল। অকস্মাৎ হিরণ্ময়ী পিতা বলিলেন, “আমি বিবাহ দিব না।” সেই অবধি হিরণ্ময়ী আর পুরন্দরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেন না। অদ্য পুরন্দর অনেক দিনর করিয়া, বিশেষ কথা আছে বলিয়া, তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। লতামণ্ডপতলে আসিয়া হিরণ্ময়ী কহিল, “আমাকে কেন ডাকিয়া আনিলে? আমি এক্ষণে আর বালিকা নহি, এপন আর তোমার সঙ্গে এমত স্থানে একাকিনী সাক্ষাৎ করা ভাল দেখায় না। আর ডাকিলে আমি আসিব না।”

যোল বৎসরের বালিকা বলিতেছে, “আমি আর বালিকা নহি” ইহা বড় মিষ্ট কথা। কিন্তু সে রস অমুভব করিবার লোক সেখানে কেহ ছিল না। পুরন্দরের বয়স বা মনের ভাব লোকপ নহে।

পুরন্দর মণ্ডপলিখিত লতা হটতে একটি পুষ্প ডাকিয়া লইয়া তাহা ছিন্ন করিতে করিতে বলিলেন, “আমি আর ডাকিব না। আমি দূরদেশে চলিলাম। তাই তোমাকে বলিয়া যাইতে আসিয়াছি।”

হি। দূরদেশে? কোথায়?

পু। সিংহলে।

হি। সিংহলে! সে কি? কেন সিংহলে যাইবে?

পু। কেন যাইব ? আমরা শ্রেষ্ঠী—বাণিজ্যার্থ যাইব।
বলিতে পুরন্দরের চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল।

হিরণ্ময়ী বিমলা হটলেন। কোন কথা কহিলেন না, অনিমেবলোচনে সম্মুখবর্তী সাগরতরঙ্গে সূর্য্যাকিরণের ক্রীড়া দেখিতে লাগিলেন। প্রাতঃকাল মুছপবন বহিতেছে,—মুছপবনোখিত অতুলতরঙ্গে বালারুণরশ্মি আরোহণ করিয়া কাঁপিতেছে—সাগরজলে তাহার অনন্ত উজ্জ্বল রেখা প্রসারিত হইয়াছে—শ্যামাঙ্গীর অঙ্গে রক্ততালঙ্কারবৎ ফেণনিচয় শোভিতেছে, তীরে জলচর পক্ষিকুল খেত রেখা সাজাইয়া বেড়াইতেছে। হিরণ্ময়ী সব দেখিলেন,—নীলজল দেখিলেন, তরঙ্গশিরে ফেণমালা দেখিলেন, সূর্য্যরশ্মির ক্রীড়া দেখিলেন—দূরবর্তী অর্ণবপোত দেখিলেন, নীলাশ্বরে কৃষ্ণবিন্দুবৎ একটি পক্ষী উড়িতেছে তাহাও দেখিলেন। শেষে ভূতলশায়ী একটি শুক কুম্বমের প্রতি দৃষ্টি করিতে করিতে কহিলেন,

“তুমি কেন যাবে—অন্যান্যবার তোমার পিতা যাইয়া থাকেন।”

পুরন্দর বলিল, “আমার পিতা বৃদ্ধ হইতেছেন। আমার এগন অর্ণোপার্জননের সময় হইয়াছে। আমি পিতার অনুমতি পাইয়াছি।”

হিরণ্ময়ী লতামণ্ডপের কাছে ললাট রক্ষা করিলেন। পুরন্দর দেখিলেন তাঁহার ললাট কৃষ্ণিত হইতেছে, অধর ক্ষুরিত হইতেছে, নাসিকার রক্ত ক্ষীত হইতেছে। দেখিলেন যে হিরণ্ময়ী কাঁদিয়া ফেলিলেন।

পুরন্দর মুখ ফিরাইলেন। তিনিও একবার আকাশ, পৃথিবী, নগর, সমুদ্র সকল দেখিলেন, কিন্তু কিছুতেই রহিল না—চক্ষের জল গাও বহিয়া পড়িল। পুরন্দর চক্ষু মুছিয়া বলিলেন,

“এই কথা বলিবার জন্য আসিয়াছি। যে দিন তোমার পিতা বলিলেন কিছুতেই আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ দিবেন না, সেই দিন হইতেই আমি সিংহলে যাইবার কল্পনা স্থির করিয়াছিলাম। ইচ্ছা আছে যে সিংহল হইতে ফিরিব না। যদি কখন তোমায় ভুলিতে পারি তবেই ফিরিব। আমি অধিক কথা বলিতে জানি না, তুমিও অধিক কথা বুলিতে পারিবে না। ইহা বুলিতে পারিবে, যে আমার পক্ষে জগৎসংসার একদিকে, তুমি একদিকে হইলে, জগৎ তোমার তুলা নহে।” এই বলিয়া পুরন্দর হঠাৎ পশ্চাৎ ফিরিয়া পাদচারণ করিয়া অন্য একটা বৃক্ষের পাতা ছিঁড়িলেন। অশ্রুবেগ কিঞ্চিৎ শমিত হইলে, ফিরিয়া আসিয়া আবার কহিলেন, “তুমি আমায় ভাল বাস তাহা জানি। কিন্তু যবে হটুক তুমি অন্যের পত্নী হইবে। অতএব তুমি আর আমায় মনে রাখিও না। তোমার সঙ্গে যেন এ জন্মে আমার আর সাক্ষাৎ না হয়।”

এই বলিয়া পুরন্দর বেগে প্রস্থান করিলেন। হিরণ্যগী আসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। রোদন সম্বরণ করিয়া একবার জ্ঞাবিলেন, “আমি যদি আজি মরি, তবে কি পুরন্দর সিংহলে যাইতে পারে? আমি কেন গলায় লতা বাঁধিয়া মরি না,— কিম্বা সমুদ্রে ঝাঁপ দিই না?” আবার ভাবিলেন, “আমি যদি মরিলাম, তবে পুরন্দর সিংহলে যাক না যাক তাহা আমায় কি?” এই ভাবিয়া হিরণ্যগী আবার কাঁদিতে বসিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

কেন যে ধনদাস বলিয়াছিলেন যে “আমি পুরন্দরের সঙ্গে হিরণের বিবাহ দিব না” তাহা কেহ জানিত না । তিনি তাঁহা কাহারও সাক্ষাতে প্রকাশ করেন নাই । জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, “ বিশেষ কারণ আছে । ” হিরণ্যরী অজ্ঞাত অনেক সঙ্কট আসিল—কিন্তু ধনদাস কোন সঙ্কটেই সম্মত হইলেন না । বিবাহের কথাষাত্রে কর্ণপাত করিতেন না । “ কথা বড় হইল ” বলিয়া গৃহিণী তিরস্কার করিতেন; ধনদাস শুনিতেন না । কেবল বলিতেন, “ গুরুদেব আসুন—তিনি আসিলে এ কথা হইবে । ”

পুরন্দর সিংহলে গেলেন । তাঁহার সিংহল যাত্রার পর দুই বৎসর এতরূপে গেল । পুরন্দর ফিরিলেন না । হিরণ্যরী কোন সঙ্কট হইল না । হিরণ্য অষ্টাদশবর্ষীয়া হইয়া উদ্যান মধ্যস্থ নবপল্লবিত চূতবৃক্ষের ছায় ধনদাসের গৃহশোভা করিতে লাগিল ।

হিরণ্যরী ইহাতে দুঃখিত হইলেন নাই । বিবাহের কথা হইলে পুরন্দরকে মনে পড়িত ; তাঁহার সেই ফুল কুসুমমালা-মণ্ডিত, কুঞ্চিত কক্ষ কুম্ভলাবলীবেষ্টিত, সহাস্য মুখসঞ্চল মনে পড়িত; তাঁহার সেই বিরদশুভ্র স্বক্ৰদেশে স্বর্ণ পুষ্পশোভিত নীল উত্তরীয় মনে পড়িত ; পদ্মহস্তে হীরকাসুরীয়গুলি মনে পড়িত ; হিরণ্যরী কাঁদিতেন । পিতার আজ্ঞা হইলে যাহাকে তাহাকে বিবাহ করিতে হইত । কিন্তু সে জীবন্ত্যুত্থাবৎ হইত । তবে তাঁহার বিবাহোদ্যোগে পিতাকে অপ্রবৃত্ত দেখিয়া, আত্মদ্রুত হউন বা না হউন, বিস্মিত হইতেন । লোকে এত বয়স অবধি কন্যা অবিবাহিত রাখে না—রাখিলেও তাহার সঙ্কট করে । তাঁহার পিতা সে কথায় কর্ণপর্যন্ত দেন না কেন ? একদিন অকস্মাৎ এবিষয়ের কিছু সন্ধান পাইলেন ।

বুসলাঙ্গরীর ।

ধনদাস বাণিজ্যহেতু চীনদেশে নির্ধৃত একটি বিচিত্র কোর্টা পাইয়াছিলেন। কোর্টা অতি বৃহৎ—ধনদাসের পত্নী তাহাতে অলঙ্কার রাখিতেন। ধনদাস-কতকগুলি নূতন অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া পত্নীকে উপহার দিলেন। শ্রেণীগতী পুরাতন অলঙ্কারগুলি কোর্টাসমেত কন্যাকে দিলেন। অলঙ্কারগুলি রাখা চাকা করিতে হিরণ্ময়ী দেখিলেন, যে তাহাতে একখানি ছিন্ন লিপির অর্দ্ধাবশেষ রহিয়াছে।

হিরণ্ময়ী পড়িতে জানিতেন। তাহাতে প্রথমেই নিজেব নাম দেখিতে পাইয়া কোর্তাহলাবিষ্ট হইলেন। পড়িয়া দেখিলেন, যে অর্দ্ধাংশ আছে তাহাতে কোন অর্থ বোধ হয় না। কে কাহাকে লিখিয়াছিল, তাহাও কিছুই বুঝা গেল না। কিন্তু তথাপি তাহা পড়িয়া হিরণ্ময়ীর মহাতীতি সঞ্চার হইল। ছিন্ন পত্র খণ্ড এইরূপ।

জ্যোতিষী গণনা করিয়া দেখিল।

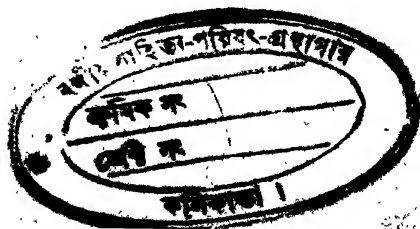
হিরণ্ময়ী কুল্য সোনার পুস্তলি

বাহ হইলে ভয়ানক বিপদ।

সর বৃথ পরস্পরে

হইতে পারে

হিরণ্ময়ী কোন অজ্ঞাত বিপদ আশঙ্কা করিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন। কাহাকে কিছু না বলিয়া পত্র খণ্ড তুলিয়া রাখিলেন।



তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

ছই বৎসরের পর আরও এক বৎসর গেল। তথাপি পুরন্দরের সিংহল হইতে আসার কোন সম্ভাব পাওয়া গেল না। কিন্তু হিরণ্যরীর হৃদয়ে তাঁহার মূর্তি পূর্ববৎই উজ্জল ছিল। তিনি মনে মনে বুঝিলেন যে পুরন্দরও তাঁহাকে ভুলিতে পারেন নাই—নচেৎ এতদিন কিরিতেন।

এইরূপে ছই আর একে তিন বৎসর গেলে, অকস্মাৎ একদিন ধনদাস বলিলেন, যে “চল, সপরিবারে কাশী যাইব। গুরুদেবের নিকট হইতে তাঁহার শিবা আসিয়াছেন। গুরুদেব সেইখানে যাইতে অনুমতি করিয়াছেন। তথায় হিরণ্যরীর বিবাহ হইবে। সেইখানে তিনি পাত্র স্থির করিয়াছেন।”

ধনদাস, পত্নী ও কন্যাকে লইয়া কাশীযাত্রা করিলেন। যথাকালে কাশীতে উপনীত হইলে পর, ধনদাসের গুরু আনন্দস্বামী আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন। এবং বিবাহের দিনস্থির করিয়া যথাশাস্ত্র উদ্যোগ করিতে বলিয়া গেলেন।

বিবাহের যথাশাস্ত্র উদ্যোগ হইল, কিন্তু ঘটা কিছুই হইল না। ধনদাসের পরিবারস্থ ব্যক্তির। ভিন্ন কেহই জানিতে পারিল না যে বিবাহ উপস্থিত। কেবল শাস্ত্রীয় আচার সকল রক্ষা করা হইল মাত্র।

বিবাহের দিন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল—এক প্রহর রাজে লগ্ন, তথাপি গৃহে বাহারা সচরাচর থাকে, তাহার। ভিন্ন আর কেহ নাই। প্রতিবাসীরাও কেহ উপস্থিত নাই। এ পর্যন্ত ধনদাস ভিন্ন গৃহস্থ কেহও জানে না যে কে পাত্র—কোথাকার পাত্র। তবে সকলেই জানিত যে যেখানে, আনন্দস্বামী বিবাহের সম্বন্ধ করিয়াছেন, সেখানে কখন অপাত্র স্থির করেন নাই।

তিনি যে কেন পাত্রের পরিচয় বাস্তব করিলেন না, তাই তিনিই জানেন—তাঁহার মনের কথা বুঝিবে কে ? একটি গৃহে পুরোহিত সম্প্রদানের উদ্যোগাদি করিয়া একাকী বসিয়া আছেন। বাহিরে ধনদাস একা বরের প্রতীক্ষা করিতেছেন। অন্তঃপুরে কন্যাসজ্জা করিয়া হিরণ্ময়ী বসিয়া আছেন—আর কোথাও কেহ নাই। হিরণ্ময়ী মনেত জাবিতেছেন—“একি রহস্য! কিন্তু পুরুন্দরের সঙ্গে যদি বিবাহ না হইল—তবে যে হয় তাহার সঙ্গে বিবাহ হউক—সে আমার স্বামী হইবে না।”

এমন সময়ে ধনদাস কন্যাকে ডাকিতে আসিলেন। কিন্তু তাঁহাকে সম্প্রদানের স্থানে লইয়া যাইবার পূর্বে, বস্ত্রের দ্বারা তাঁহার ছুই চক্ষুঃ দৃঢ়তর বাধিলেন। হিরণ্ময়ী কহিলেন, “এ কি পিতঃ ?” ধনদাস কহিলেন, “গুরুদেবের আজ্ঞা। তুমিও আমার আজ্ঞামত কার্য্য কর। মন্ত্রগুলি মনেত বলিও।” শুনিয়া হিরণ্ময়ী কোন কথা কহিলেন না। ধনদাস দৃষ্টিহীনা কন্যাকে হস্ত ধরিয়া সম্প্রদানের স্থানে লইয়া গেলেন।

হিরণ্ময়ী তথায় উপনীত হইয়া যদি কিছু দেখিতে পাঠিতেন, তাহা হইলে দেখিতেন, যে পাত্রও তাঁহার ন্যায় আবৃতমনন। এইরূপে বিবাহ হইল। সে স্থানে গুরুপুরোহিত এবং কন্যাকর্তা ভিন্ন আর কেহ ছিল না। বরকন্যা কেহ কাহাকে দেখিলেন না। শুভদৃষ্টি হইল না।

সম্প্রদানান্তে আনন্দস্বামী বরকন্যাকে কহিলেন, যে “তোমাদিগের বিবাহ হইল, কিন্তু তোমরা পরস্পরকে দেখিলে না। কন্যার কুমারী নাম যুচানই এই বিবাহের উদ্দেশ্য; ইহজন্মে কর্ণন তোমাদের পরস্পরের সাক্ষাৎ হইবে কি না বলিতে পারি না। যদি হয়, তবে কেহ কাহাকে চিনিতে পারিবে না। চিনিবার আশি একটি উপায় করিয়া দিতেছি। আমার হাতে

ছুইটি অঙ্গুরীর আছে । ছুইটি ত্রিক একপ্রকার । অঙ্গুরীর বে-
 প্রান্তরে নিশ্চিত তাহা আর পাওয়া যায় না । এবং অঙ্গুরীর
 ভিতরের পৃষ্ঠে একটি মন্থর অঙ্কিত আছে । ইহার একটি বরকে
 একটি কন্যাকে বিজ্ঞান । একরূপ অঙ্গুরীর অন্য কেহ পাইবেনা—
 বিশেষ এই মন্থরের চিত্র অননুকরণীয় । ইহা আমার স্বহস্ত-
 খোদিত । যদি কন্যা কোন পুরুষের হস্তে এইরূপ অঙ্গুরীর
 দেখেন, তবে জানিবেন যে সেই পুরুষ তাঁহার স্বামী । যদি
 বর কখন কোন স্ত্রীলোকের হস্তে এইরূপ অঙ্গুরীর দেখেন, তবে
 জানিবেন যে তিনিই তাঁহার পত্নী । তোমরা কেহ এ অঙ্গুরীর
 হারাইও না, বা কাহাকে দিও না, অগ্নাতাব হইলেও বিক্রয়
 করিও না । কিন্তু ইহাও আজ্ঞা করিতেছি, যে অদ্য হইতে
 পঞ্চবৎসর মধ্যে কদাচ এই অঙ্গুরীর পরিও না । অদ্য আষাঢ়
 মাসের শুক্লা পঞ্চমী, রাজি একাদশ দণ্ড হইয়াছে, ইহার পর
 পঞ্চম আষাঢ়ের শুক্লা পঞ্চমীর একাদশ দণ্ড রাজি পর্য্যন্ত
 অঙ্গুরীর ব্যবহার নিষেধ করিলাম । আমার নিষেধ অবহেলা
 করিলে গুরুতর অসম্মল ঘটিবে ।”

এই বলিয়া আনন্দস্বামী বিদ্যার হইলেন । ধনদাস কন্যার
 চকুর বন্ধন মোচন করিলেন । হিরণ্ময়ী চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন
 যে গৃহমধ্যে কেবল তাঁহার পিতা ও পুরোহিত আছেন—তাঁহার
 স্বামী নাই । বিবাহরাত্রি একাই ঝাপন করিলেন ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

বিবাহান্তে খনদাস জী ও কন্যাকে লইয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন । আরও চারি বৎসর অতিবাহিত হইল । পুরন্দর ফিরিয়া আসিলেন না—হিরণ্ময়ীর পক্ষে এখন ফিরিলেই কি না ফিরিলেই কি ?

পুরন্দর যে এই সাত বৎসরে ফিরিল না, ইহা ভাবিয়া হিরণ্ময়ী দুঃখিতা হইলেন । মনে ভাবিলেন, “ তিনি যে আজিও আমার ভুলিতে পারেন নাই বলিয়া আসিলেন না এমত কদাচ সম্ভবে না । তিনি জীবিত আছেন কি না সংশয় । তাঁহাব দেখার আমি কামনা করি না, এখন আমি অন্যের জী । কিন্তু আমার বাল্যকালের স্মৃৎ বাঁচিয়া থাকুন, এ কামনা কেন না করিব ? ”

খনদাসেবও কোন কারণে না কোন কাৰণে চিন্তিত ভাব প্রকাশ তইতে লাগিল, ক্রমে চিন্তা গুরুতর হইয়া শেষে দারুণ রোগে পরিণত হইল । তাহাতে তাঁহাব মৃত্যু হইল । খনদাসের পত্নী অসুস্থতা-হইলেন । হিবণ্ময়ী আর কেহ ছিল না, এজন্য হিরণ্ময়ী মাতার চরণ ধারণ করিয়া অনেক রোদন করিয়া কহিলেন, যে তুমি মরিও না । কিন্তু শ্রেষ্ঠীপন্নী শুনিলেন না । তখন হিরণ্ময়ী পৃথিবীতে একাকিনী হইলেন ।

মৃত্যুকালে হিরণ্ময়ীর মাতা তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলেন, যে “ বাছা তোমাব কিসের ভাবনা ? তোমার একজন স্বামী অবশ্য আছেন । নিয়মিত কাল অতীত হইলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলেও হইতে পারে । না হয় তুমিও নিতান্ত বালিকা নহ । বিশেষ পৃথিবীতে যে সহায় প্রধান—খন—তাহা তোমার অতুল পরিমাণে রহিল ”

কিছু সে আশা বিকল হইল—ধনদাসের মৃত্যুর পর দেখা গেল যে তিনি কিছুই রাখিয়া যান নাই । অলঙ্কার, অট্টালিকা এবং গার্হস্থ্য সামগ্রী তির্য আর কিছুই নাই । অনুসন্ধান হিরণ্ময়ী জানিলেন যে ধনদাস কয়েক বৎসর হইতে বাণিজ্যে কতিপয় হইয়া আসিতেছিলেন । তিনি তাহা কাহাকেও না বলিয়া শোধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন । ইহাই তাহার চিন্তার কারণ । শেষে শোধনও অসাধ্য হইল । ধনদাস মনের ক্লেশে পীড়িত হইয়া পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

এই সকল সম্বাদ শুনিয়া অপরাপর শ্রেণীর আসিয়া হিরণ্ময়ীকে কহিল যে তোমার পিতা আমাদের ঋণগ্রস্ত হইয়া মরিয়াছেন । আমাদের ঋণ পরিশোধ করা শ্রেণীকন্যা অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে তাহাদের কথা যথার্থ । তখন হিরণ্ময়ী সর্বস্ব বিক্রয় করিয়া তাহাদের ঋণ পরিশোধ করিলেন । বাসগৃহ পর্য্যন্ত বিক্রয় করিলেন ।

তখন হিরণ্ময়ী অন্নবানের ত্রুণে দুঃখিনী হইয়া নগরপ্রান্তে এক কুটীরমধ্যে একা বাস করিতে লাগিলেন । কেবল মাঝে এক সহায় পরম হিতৈষী আনন্দস্বামী, কিছু তিনি তখন দূরদেশে ছিলেন । হিরণ্ময়ীর এমন একটি লোক ছিল না যে আনন্দস্বামীর নিকটে প্রবেশ করেন ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

হিরণ্ময়ী যুগলী এবং সুন্দরী—একাকিনী এক গৃহে শয়ন করা ভাল নহে । আপদও আছে—কলঙ্কও আছে । অমলা নামে এক গোপকন্যা হিরণ্ময়ীর প্রতিবাসিনী ছিল । সে বিধবা—তাহার একটি কিশোরবয়স্ক পুত্র এবং কয়েকটি কন্যা । তাহার যৌবনকাল অতীত হইয়াছিল । সঙ্করিতা বলিয়া

তাহার খ্যাতি ছিল। হিরণ্ময়ী রাতে আসিয়া তাহার গৃহে শয়ন করিতেন।

একদিন হিরণ্ময়ী অমলা গৃহে শয়ন করিতে আসিলে পর, অমলা তাহাকে কহিল, “সম্বাদ শুনিয়াছ, পুরন্দর শ্রেষ্ঠী না কি আট বৎসরের পর নগরে ফিরিয়া আসিয়াছে।” শুনিয়া হিরণ্ময়ী মুখ ফিরাইলেন—চন্দের জল অমলা না দেখিতে পারা। পৃথিবীর সঙ্গে হিরণ্ময়ীর শেষ সম্বন্ধ ঘুটিল। পুরন্দর তাঁহাকে ভুলিয়া গিয়াছে। নচেৎ ফিরিত না। পুরন্দর এক্ষণে মনে রাখুক বা তলুক, তাঁহার লাভ বা ক্ষতি কি? তথাপি তাহার স্নেহের কথা ভাবিয়া যাবজ্জীবন কাটাইয়াছেন, সে ভুলিয়াছে ভাবিতে হিরণ্ময়ীর মনে কষ্ট হইল। হিরণ্ময়ী একবার ভাবিলেন—“ভুলেন নাই—কতকাল আমার জন্য বিদেশে থাকিবেন? বিশেষ তাহাতে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে—আর দেশে না আসিলে চলিবে কেন?” আবার ভাবিলেন “আমি কুলটা সন্দেহ নাই—নহিলে পুরন্দরের কথা মনে করি কেন?”

অমলা কহিল, “পুরন্দরকে কি তোমার মনে পড়িতেছে না? পুরন্দর শচীন কথক ছিল।”

হি। তিনি

অ। তা সে ফিরে এসেছে—কত নৌকা যে ধন এনেছে তাহা শুনে সংখ্যা করা যায় না। এত ধন নাকি এ তামলিপে কেহ কখন দেখে নাই।

হিরণ্ময়ীর হৃদয়ে রক্ত একটু থর বহিল। তাঁহার দারিদ্র্য দশা মনে পড়িল, পূর্বসম্বন্ধও মনে পড়িল। দারিদ্র্যের আলা স্বভাব আলা। তাহার পরিবর্তে এই অতুল ধনরাশি হিরণ্ময়ীর হৃদয়ে পারিত। ইহা ভাবিয়া তাহার থর রক্ত না বহে এমন কীলোকের কথি অসম আছে। হিরণ্ময়ী কলেক কাল অন্যায়মে

ধাকিয়া, পরে অন্য প্রসঙ্গ তুলিল। শেষ শয়নকালে দ্বিজানা করিল, “অমলে, সেই শ্রেষ্ঠীপুত্রের বিবাহ হইয়াছে?”

অমলা কহিল, “না, বিবাহ হয় নাই।”

হিরণ্মীর ইচ্ছায় সকল অবশ হইল। সে রাত্রে আর কোন কথা হইল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

পরে এক দিন অমলা হাসিমুখে হিরণ্মীর নিকটে আসিয়া মধুব ভৎসনা করিয়া কহিল, “হাঁগা বাছা, তোমার কি এমনই ধর্ম?”

হিরণ্মী কহিল, “কি করিয়াছি?”

অম। আমার কাছে এত দিন তা বলিতে নাই?

হি। কি বলি নাই?

অম। পুরন্দর শেষ্ঠীর সঙ্গে তোমার এত আত্মীয়তা! হিরণ্মী ঈষলজ্জিতা হইলেন, বলিলেন, “তিনি বাল্যকালে আমার প্রতিবাসী ছিলেন—তার বলিব কি?”

অম। শুধু প্রতিবাসী? দেখ দেখি কি এনেছি!

এই বলিয়া অমলা একটুকোটা বাহির করিল। কোটা খুলিয়া তাহার মধ্য হইতে অপূর্বদর্শন, মহা প্রভায়ুক্ত, মহামূল্য হীরার হার বাহির করিয়া হিরণ্মীকে দেখাইল। শ্রেষ্ঠীকন্যা হোয়া চিনিত—বিস্মিতা হইয়া কহিল,

“এ যে মহামুলা—এ কোথায় পাইলে?”

অম। ইহা তোমাকে পুরন্দর পাঠাইয়া দিয়াছে। তুমি আমার গৃহে থাক গুনিয়া আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া ইহা তোমাকে দিতে বলিয়াছে।

হিরণ্ময়ী ভাবিয়া দেখিল, এই হার গ্রহণ করিলে, চিরকাল অম্বা দারিত্র্যমোচন হয়। ধনদাসের আদরের কন্যা। আর অন্নবস্ত্রের কষ্ট সহিতে পারিতেনেছিল না; অতএব হিরণ্ময়ী ক্রমেক বিমনা হইল। পরে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, “অমলে তুমি বণিককে কহিও যে আমি ইহা গ্রহণ করিব না।”

অমলা বিস্মিতা হইল। বলিল, “সে কি? তুমি কি পাগল, না আমার কপাল বিশ্বাস করিতেছ না।”

হি। আমি তোমার কথায় বিশ্বাস করিতেছি—আর পাগলও নই। আমি উহা গ্রহণ করিব না।

অমলা অনেক তিরস্কার করিতে লাগিল। হিরণ্ময়ী কিছুতেই গ্রহণ করিলেন না। তখন অমলা হার লইয়া রাজা মদনদেবের নিকটে গেল। রাজাকে প্রণাম করিয়া হার উপহাস দিল। বলিল, “এ হার আপনাকে গ্রহণ করিতে হইবে। এ হার আপনারই যোগ্য।” রাজা হার লইয়া অমলাকে যথেষ্ট অর্থ দিলেন। হিরণ্ময়ী ইহার কিছুই জানিল না।

ইহার কিছুদিন পরে, পুংস্করের একজন পরিচারিক। হিরণ্ময়ীর নিকটে আসিল। সে কহিল, “আমার প্রভু বলিয়া পাঠাইলেন যে, আপনি যে পর্ণকুটারে বাস করেন ইহা তাঁহার সহ্য হয় না। আপনি তাঁহার বালকালের সখী; আপনার গৃহ তাঁহার গৃহ একই। তিনি এমন বলেন না যে আপনি তাঁহার গৃহে গিয়া বাস করুন। আপনার পিতৃগৃহ তিনি ধনদাসের মহাজনের নিকট ক্রয় করিয়াছেন। তাহা আপনাকে দান করিতেছেন। আপনি গিয়া সেইখানে বাস করুন, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা।

হিরণ্ময়ী দারিত্র্যজন্য যত দুঃখভোগ করিতেছিলেন, তন্মধ্যে

পিতৃভবন হইতে নির্কাসনই তাঁহার সর্বপ্রাণে গুরুতর বোধ হইত। যেখানে বাল্যক্রীড়া করিয়া ছিলেন, যেখানে পিতা মাতার সহ বাস করিতেন, যেখানে তাঁহাদিগের মৃত্যু দেখিয়াছেন, সেখানে যে আর বাস করিতে পান না, এ কষ্টই গুরুতর বোধ হইত। সেই ভবনের কক্ষের তাঁহার চক্ষে জল আসিল। তিনি পরিচারিকাকে আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, “এ দাম আমার গ্রহণ করা উচিত নহে—কিন্তু আমি এ লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। তোমার শ্রেষ্ঠর সর্বপ্রকার মঙ্গল হউক!”

পরিচারিকা প্রণাম হইয়া বিদায় হইল। অমলা উপস্থিতা ছিল। হিরণ্ময়ী তাহাকে বলিলেন, “অমলে, তথায় আমার একা বাস করা হইতে পারে না। তুমিও তথায় বাস করিবে চল।”

অমলা স্বীকৃতা হইল। উভয়ে গিয়া ধনদাসের গৃহে বাস করিতে লাগিলেন।

তথাপি অমলাকে সর্বদা পুরন্দরের গৃহে ঘাইতে হিরণ্ময়ী একদিন নিষেধ করিলেন। অমলা আর ঘাইত না।

পিতৃগৃহে গমনাবধি হিরণ্ময়ী একটা বিষয়ে বড় বিস্মিতা হইলেন। একদিন অমলা কহিল, “তুমি সংসারনির্কাসনের জন্য বাস্ত হইও না, বা শারীরিক পরিশ্রম করিও না। নাকনাদী আমার কার্য্য হইয়াছে—আর এখন অর্থের অভাব নাই। অতএব আমি সংসার চালাইব—তুমি সংসারে কর্ত্রী হইয়া থাক।” হিরণ্ময়ী দেখিলেন অমলার অর্থের বিলক্ষণ প্রাচুর্য্য। মনে হইল না প্রকারে সন্দিহান হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

বিবাহের পর পঞ্চমাবাহের শুক্ল পক্ষমী আসিরা উপস্থিত হইল। হিরণ্ময়ী এই কথা স্মরণ করিয়া সন্ধ্যাকালে বিমনা হইয়া বসিয়া ছিলেন। ভাবিতেছিলেন “শুরুদেবের আজ্ঞানুসারে আমি কালি হইতে অঙ্গুরীটি পরিতে পারি। কিন্তু পরিব কি? পরিয়া আমার কি লাভ? হর ত স্বামী পাইব, কিন্তু স্বামী পাইবার আমার বাসনা নাই। অথবা চিরকালের জন্য কেনই বা পরের মূর্ত্তি মনে আঁকিয়া রাখি। এ দুঃস্থ হৃদয়কে শাসিত করাই উচিত। নহিলে ধর্ম্মে পতিত হইতেছি।”

এমত সময়ে অমলা বিশ্বয়বিহ্বলা হইয়া আসিরা কহিল, “কি সর্বনাশ! আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। না জানি কি হইবে?”

হি। কি হইয়াছে?

অ। রাজপুত্রী হইতে তোমার জন্য শিবিকা লইয়া দাগ দাগী আসিয়াছে। তোমাকে লইয়া যাইবে।

হি। তুমি পাগল হইয়াছ। আমাকে রাজবাড়ী হইতে লইতে আসিবে কেন?

এমত সময়ে রাজদূতী আসিরা প্রণাম করিল এবং কহিল যে “রাজাধিরাজ পরম শুভ্রারক শ্রীমদনদেবের আজ্ঞা যে হিরণ্ময়ী এই মুহূর্ত্তেই শিবিকারোহণে রাজ্যবরোধে যাইবেন।”

হিরণ্ময়ী বিস্মিতা হইলেন। কিন্তু অস্বীকার করিতে পারিলেন না। রাজাজ্ঞা অলংঘ্য। বিশেষ রাজা মদনদেবের অবরোধে যাইতে কোন শকা নাই। রাজা পরমধার্মিক এবং স্নেহভাজন বলিয়া খ্যাত। তাঁহার প্রত্যয়ে কোন রাজপুরুষও কোন স্ত্রীলোকের উপর কোন অত্যাচার করিতে পারে না।

হিরণ্ময়ী অমলাকে বলিলেন, “অমলে আমি রাজদর্শনে
যাইতে সম্মত। তুমি সঙ্গে চল।”

অমলা স্বীকৃত হইল।

তৎসম্ভাব্যাহারে শিবিকারোহণে হিরণ্ময়ী রাজাবরোধ-
মধ্যে প্রবেশিত হইলেন। প্রতিহারী রাজাকে নিবেদন করিল
যে শ্রেষ্ঠীকনয়া আসিয়াছে। রাজা পাইয়া প্রতিহারী এক
হিরণ্ময়ীকে রাজসমক্ষে লইয়া আসিল। অমলা বাহিরে রহিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

হিরণ্ময়ী রাজাকে দেখিয়া বিস্মিতা হইলেন। রাজা দীর্ঘা-
কৃতি পুরুষ, কবাটবক্ষ; দীর্ঘহস্ত; অতি সুগঠিতাকৃতি; প্রশস্ত
ললাট; বিস্ময়িত, আয়ত চক্ষু; শান্ত মূর্তি—এরূপ সুন্দর
পুরুষ কদাচিৎ জীলোকের নয়নপথে পড়ে। রাজাও শ্রেষ্ঠী-
কন্যাকে দেখিয়া জানিলেন যে রাজাবরোধেও এরূপ সুন্দরী
দুর্লভ।

রাজা কহিলেন, “তুমি হিরণ্ময়ী?” হিরণ্ময়ী কহিলেন,
“আমি আপনার দাসী।”

রাজা কহিলেন, “কেন তোমাকে ডাকাইয়াছি তাহা শুনা।
তোমার বিবাহের কথা মনে পড়ে?”

হি। পড়ে।

রাজা। সেই রাজ্যে আনন্দস্বামী তোমাকে যে অক্ষুরীম
দিয়াছিলেন, তাহা তোমার কাছে আছে?

হি। মহারাজ! সে অক্ষুরীম আছে। কিন্তু সে সকল
অতি গুহ্য বৃত্তান্ত, কি প্রকারে আপনি তাহা অবগত হইলেন?

রাজা তাহার কোন উত্তর না দিয়া কহিলেন, “সে অক্ষুরীম
কোথায় আছে? আমাকে দেখাও।”

হিরণ্ময়ী কহিলেন, “ঐহা আমি গৃহে রাখিয়া আনিয়াছি । পঞ্চ বৎসর পরিপূর্ণ হইতে আরও কয়েক দশক বিলম্ব আছে—অতএব তাহা পরিত্যে আনন্দস্বামীর বে নিবেদন ছিল—তাহা এখনও আছে ।

রাজা । ভালই--কিন্তু সেই অঙ্গুরীরের অঙ্গুরণ দ্বিতীয় যে অঙ্গুরীর তোমার স্বামীকে আনন্দস্বামী দিয়াছিলেন, তাহা দেখিলে চিনিতে পারিবে ?

হি । উভয় অঙ্গুরীর একই রূপ স্মৃতিরং দেখিলে চিনিতে পারিব ।

তখন প্রতিহারী রাজাক্ত প্রাপ্ত হইয়া এক সুবর্ণের কোঁটা আনিল । রাজা তাহার মধ্যাহ্নে একটি অঙ্গুরীর লইয়া বলিলেন, “দেখ এই অঙ্গুরীর কাহার ?”

হিরণ্ময়ী অঙ্গুরীর প্রদীপালোকে বিলক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, “দেব ! এই আমার স্বামীর অঙ্গুরীর বটে, কিন্তু আপনি ঐহা কোথায় পাইলেন ?” পরে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, দেব ! ঐহাতে জানিলাম যে আমি বিধবা হইয়াছি । স্বজনহীন মৃতের ধন আপনার হস্তগত হইয়াছে । নহিলে তিনি জীবিতাবস্থায় ঐহা ত্যাগ করিবার সম্ভাবনা ছিল না ।”

রাজা হাসিয়া কহিলেন, “আমার কথায় বিশ্বাস কর, তুমি বিধবা নহ ।”

হি । তবে আমার স্বামী আমার অপেক্ষাও দরিদ্র । ধনলোভে ঐহা বিক্রয় করিয়াছেন ।

রা । তোমার স্বামী ধনী ব্যক্তি ।

হি । তবে আপনি বলেছেন কৌশলে তাঁহার নিকট ঐহা অপহরণ করিয়াছেন ।

রাজা এই হাস্যাত্মক কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন । বলি-

লেন “তোমার বড় সাহস ! রাজা মদনদেব চোর, ইহা আর কেহ বলে না ।”

হি । নচেৎ আপনি এ অঙ্গুরীয় কোথায় পাইলেন ?

রা । “আনন্দস্বামী তোমার বিবাহের রাত্রে ইহা আমার অঙ্গুলিতে পরাইয়া দিয়াছেন ।

হিরণ্ময়ী তখন লজ্জায় অধোমুখী হইয়া কহিলেন, “আর্য্য-পুত্র ! আমার অপরাধ ক্ষমা করুন—আমি চপলা, না জানিয়া কটু কথা বলিয়াছি ।”

নবম পরিচ্ছেদ ।

হিরণ্ময়ী রাজমহিষী, ইহা শুনিয়া হিরণ্ময়ী অভ্যস্ত বিস্মিতা হইলেন । কিন্তু কিছুমাত্র আফ্লাদিত হইলেন না । বরং বিষণ্ণ হইলেন । ভাবিতে লাগিলেন, যে “আমি এত দিন পুরন্দরকে পাই নাই বটে, কিন্তু পরপত্নীদের যত্নগোভোগ করি নাই । এক্ষণ হইতে আমার সে যত্নগা আরম্ভ হইল । আর আমি হৃদয়মধ্যে পুরন্দরের পত্নী—কি প্রকারে অন্যান্যরাগিনী হইয়া এই মহাত্মার গৃহ কলঙ্কিত করিব ?” হিরণ্ময়ী এই রূপ ভাবিতে-
 ছিলেন, এমত সময়ে রাজা বলিলেন,

“হিরণ্ময়ী ! তুমি আমার মহিষী বটে, কিন্তু তোমাকে গ্রহণ করিবার পূর্বে আমার কয়েকটি কথা জিজ্ঞাস্য আছে । তুমি বিনামূল্যে পুরন্দরের গৃহে বাস কর কেন ?”

হিরণ্ময়ী অধোবদন হইলেন । রাজা পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন,

“তোমার দাসী অমলা সর্বদা পুরন্দরের গৃহে বাতায়াজ করে কেন ?”

হিরণ্ময়ী আরও মজ্জাবনতমুখী হইয়া রহিলেন । ভাবিতে-
হিলেন “রাজা মদনদেব কি সৰ্ব্বজ্ঞ ?”

তখন রাজা কহিলেন, “আর একটা গুরুতর কথা আছে ।
তুমি পরনারী হইয়া পুরন্দরপ্রদত্ত হীরকহার গ্রহণ করিয়াছিলে
কেন ?”

এবার হিরণ্ময়ী কথা কহিলেন । বলিলেন, “আর্য্যাপুত্র,
আনিলাম আপনি সৰ্ব্বজ্ঞ নহেন । হীরকহার আমি ফিরিয়া
দিয়াছি ।”

রাজা । তুমি সেই হার আমার নিকট বিক্রয় করিয়াছ ।
এই দেখ সেই হার । এই বলিয়া রাজা কোটার মধ্যহইতে
হার বাহির করিয়া দেখাইলেন । হীরণ্ময়ী হীরকহার চিনিতে
পারিয়া বিস্মিতা হইলেন ।

কহিলেন,

“আর্য্যাপুত্র, এ হার কি আমি স্বয়ং আসিয়া আপনার কাছে
বিক্রয় করিয়াছি ?”

রা । না, তোমার দাসী বা দূতী অমলা আসিয়া বিক্রয়
করিয়াছে । তাহাকে ডাকাইব ?

হিরণ্ময়ীর অমৰ্ষাশ্লিষ্ট বদনমণ্ডলে একটু হাসি দেখা দিল ।
বলিলেন,

“আর্য্যাপুত্র ! অপরাধ ক্ষমা করুন । অমলাকে ডাকাইতে
হইবে না—আমি এ বিক্রয় স্বীকার করিতেছি ।”

এবার রাজা বিস্মিত হইলেন । বলিলেন, “স্বীলোকের
চরিত্র অসম্ভাবনীয় । তুমি পরের পত্নী হইয়া পুরন্দরের নিকট
কেন এ হার গ্রহণ করিলে ?”

হি । প্রণয়োপহার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি ।

রাজা আরও বিস্মিত হইলেন । জিজ্ঞাসা করিলেন, “সে কি ? কি প্রকার প্রণয়োপহার ?”

হি । আমি কুলটা । মহারাজ ! আমি আপনার গ্রহণের যোগ্য নহি । আমি প্রণাম করিতেছি । আমাকে বিদায় দিন । আমার সঙ্গে বিবাহ বিস্মৃত হউন ।

হিরণ্ময়ী রাজাকে প্রণাম করিয়া গমনোদ্ভূতা হইয়াছেন, এমত সময়ে রাজার বিন্মরবিকাশক মুখকান্তি অকস্মৎ প্রকৃত হইল । তিনি উচ্চৈর্হাস্য করিয়া উঠিলেন । হিরণ্ময়ী ফিরিল ।

রাজা কহিলেন, “হিরণ্ময়ি ! তুমিই জিনিলে,—আগি হারিলাম । তুমিও কুলটা নহ, আমিও তোমার স্বামী নহি । যাইও না ।”

হি । মহারাজ ! তবে এ কাণ্ডটা কি আমাকে বুঝাইয়া বলুন । আমি অতি সামান্য জ্ঞী—আমার সঙ্গে আপনার তুল্য গস্তীরপ্রকৃতি ব্রজাধিরাজের রহস্য সম্ভবে না ।

রাজা হাস্যভাগ না করিয়া বলিলেন, “আমার নায় রাজারই একরূপ রহস্য সম্ভবে । ছয় বৎসর হইল তুমি একখানি পত্রাঙ্ক অনকারমধ্যে পাইয়াছিলে ? তাহা কি আছে ?”

হি । মহারাজ ! অ.প.নি সৰ্ব্বজ্ঞই বটে । পত্রাঙ্ক আমার গৃহে আছে ।

র। । তুমি শিবিকাবোহণে পুনশ্চ গৃহে গিয়া সেই পত্রাঙ্ক দইয়া আইস । তুমি আসিলে আমি সকল কথা বলিব ।

দশম পরিচ্ছেদ ।

হিরণ্ময়ী রাজার আজ্ঞায় শিবিকারোহণে স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং তথা হইতে সেই পূর্ববর্ণিত পত্রাঙ্ক লইয়া পুনশ্চ রাজসন্নিধানে আসিলেন । রাজা সেই পত্রাঙ্ক দেখিয়া, আর একখানি পত্রাঙ্ক কোটা হইতে বাহির করিয়া হিরণ্ময়ীকে দিলেন । বলিলেন “উভয় অঙ্ককে মিলিত কর ।” হিরণ্ময়ী উভয় অঙ্ক মিলিত করিয়া দেখিলেন, মিলিল । রাজা কহিলেন “উভয় অঙ্ক একত্রিত করিয়া পাঠ কর ।” তখন হিরণ্ময়ী নিম্নলিখিত মত পাঠ করিলেন ।

“(ম্যোতিষী গণনা করিয়া দেখিলাম) যে ভূমি যে কল্পনা করিয়াছ তাহা কর্তব্য নহে । (হিরণ্ময়ী তুলা সোণার পুস্তককে) কখন চিরবৈধব্যে নিঃশিষ্ট করা যাইতে পারে না । তাহার (বিবাহ হইলে ভয়ানক বিপদ ।) তাহার চিরবৈধব্য ঘটবে গণনা দ্বারা জানিয়াছি । তবে পঞ্চবৎসর (পর্যন্ত পরম্পরে) যদি দম্পতী মুখদর্শন না করে, তবে এই গ্রহ হইতে যথার্থে নিকৃতি (হইতে পারে) তাহার বিধান অগ্নি করিতে পারি ।”

পাঠ সমাপন হইলে, রাজা কহিলেন, “এই লিপি আনন্দ স্বামী তোমার পিতাকে লিখিয়াছিলেন ।”

হি । তাহা এখন বুঝিতে পারিতেছি । কেন বা আমাদের বিবাহকালে নয়ন হৃত হইয়াছিল—কেনই বা গোপনে সেই অঙ্কত বিবাহ হইয়াছিল—কেনই বা পঞ্চবৎসর অঙ্গুরীয় ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি । কিন্তু আর ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না ।

• রাজা । আর ত অবশ্য বুঝিয়াছ যে এই পত্র পাইয়াই তোমার পিতা পুরন্দরের সহিত সম্বন্ধ রহিত করিলেন । পুরন্দর সেই ভূগুণে সিংহলে গেল ।

এদিকে আনন্দস্বামী পাত্ৰাভুসন্ধান করিয়া একটি পাত্ৰ স্থির করিলেন। পাত্ৰের কোণী গণনা করিয়া জানিলেন, যে পাত্ৰটির অশীতি বৎসর পরমায়ুঃ। তবে অষ্টাবিংশতি বৎসর বয়স অতীত হইবার পূর্বে, মৃত্যুর এক সম্ভাবনা ছিল। গণিয়া দেখিলেন যে ঐ বয়স অতীত হইবার পূর্বে এবং বিবাহের পঞ্চবৎসর মধ্যে পরীশয়্যার শয়ন করিয়া তাহার আশ্রয়্যাগ করিবার সম্ভাবনা। কিন্তু যদি কোন রূপে পঞ্চবৎসর জীবিত থাকেন তবে দীর্ঘজীবী হইবেন।

অতএব পাত্ৰের ত্রয়োবিংশতি বৎসর অতীত হইবার সময়ে বিবাহ দেওয়া স্থির করিলেন। কিন্তু এত দিন অবিবাহিত থাকিলে পাছে তুমি কোন প্রকার চঞ্চলা হও, বা গোপনে কাহাকে বিবাহ কর, এই জনা তোমাকে ভয় দেখাইবার কারণে এই পাত্ৰাঙ্ক তোমার অলঙ্কার মধ্যে রাখিয়াছিলেন।

তৎপরে বিবাহ দিয়া পঞ্চবৎসর সাক্ষাৎ না হয়, তাহার জন্য যে যে কৌশল করিয়াছিলেন, তাহা স্মৃত আছে। সেই জন্যই পরস্পরের পরিচয় মাত্র পাও নাই।

কিন্তু সম্প্রতি কয়েক মাস হইল বড় গোলযোগ হইয়া উঠিয়াছিল। কয়েক মাস হইল স্বামী এ নগরে আসিয়া, তোমার দারিদ্র্য শুনিয়া নিতান্ত ছঃখিত হইলেন। তিনি তোমাকে দেখিয়া আসিয়া ছিলেন, কিন্তু সাক্ষাৎ করেন নাই। তিনি আসিয়া আশ্রয় সন্নিহিত সাক্ষাৎ করিয়া আত্মপূর্ব্বিক তোমার বিবাহ বুঝাচ্ছ কহিলেন। পরে কহিলেন,

“আনি যদি জানিতে পারিতাম যে হিরণ্যী এক্ষণ দারিদ্র্যাবস্থায় আছে, তাহা হইলে আমি উহা মোচন করিতাম। এক্ষণে আপনি উহার প্রতীকার করিবেন। এ বিষয়ে আমার কই আপনাদের সঙ্গী জানিবেন। আপনার ঋণ আমি পরিশোধ করিব।”

সম্প্রতি আমার আর একটি অসুযোগ রক্ষা করিতে হইবে । হিরণ্যবীর স্বামী এই নগরে বাস করিতেছেন । উহাদের পরস্পর সাক্ষাৎ না হয়, ইহা আপনি দেখিবেন ।” এই বলিয়া তোমার স্বামীর পরিচয়ও আমার নিকটে দিলেন । সেই অবধি অমলা যে অর্ধব্যয়ের দ্বারা তোমার দারিদ্র্যহুঃখ মোচন করিয়া আসিতেছে তাহা আমাহইতে প্রাপ্ত । আমিই তোমার পিতৃ-গৃহ ক্রয় করিয়া তোমাকে বাস করিতে দিয়াছিলাম । হার আমিই পাঠাইয়াছিলাম—সেও তোমার পরীক্ষার্থ ।”

হি । তবে আপনি এ অঙ্গুরীয় কোথায় পাইলেন ? কেনই বা আমার নিকট স্বামী রূপে পরিচয় দিয়া, আমাকে প্রতারিত করিয়াছিলেন ? পুবন্দরের গৃহে বাস করিতেছি বলিয়া কেনই বা অসুযোগ করিতেছিলেন ?

রাজা । যে দণ্ডে আমি আনন্দস্বামীর অসুজ্ঞা পাইলাম সেই দণ্ডেই আমি তোমার প্রহরার লোক নিযুক্ত করিলাম । সেই দিনই অমলা দ্বারা তোমার নিকট হার পাঠাই । তার পর অদ্য পঞ্চম বৎসর পূর্ব হইবে জানিয়া, তোমার স্বামীকে ডাকাইয়া কহিলাম, তোমার বিবাহবৃত্তান্ত আমি সমুদায় জানি । তোমার সেই অঙ্গুরীয়টি লইয়া একাদশ দণ্ড রাজের সম্মুখে আসিও । তোমার জীর সহিত মিলন হইবে । তিনি কহিলেন যে ‘মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য কিন্তু বনিতার সহিত মিলনের আমার স্পৃহা নাই । না হইলেই ভাল হয় ।’ আমি কহিলাম, ‘আমার আজ্ঞা ।’ তাহাতে তোমার স্বামী স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু কহিলেন যে ‘আমার সেই বনিতা হুচরিত্রা কি হুচরিত্রা তাহা আপনি জ্ঞান করেন । যদি হুচরিত্রা জী গ্রহণ করিতে আজ্ঞা করেন তবে আপনাকে অধর্ষ স্পর্শিবে ।’ আমি উত্তর করিলাম ‘সেই অঙ্গুরীয়টি দিয়া যাও । আমি তোমার জীর চরিত্র

পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ করিতে বলিব। তিমি কহিলেন, ‘এ অঙ্গুরীর অমনা কে বিশ্বাস করিয়া দিতাম না, কিন্তু আপনাকে অবিশ্বাস নাই।’ আমি অঙ্গুরীর লইয়া তোমার যে পরীক্ষা করিয়াছি, তাহাতে তুমি স্বামী হইয়াছ।

হি। পরীক্ষা ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

এমত সময়ে রাজপুত্রের মঙ্গলসূচক ঘোরতর বাদ্যোদ্যম হইয়া উঠিল। রাজা কহিলেন, “রাজি একাদশদণ্ড অতীত হইল—পরীক্ষার কথা পশ্চাৎ বলিব। এক্ষণে তোমার স্বামী আসিয়াছেন; শুভলগ্নে তাঁহার সহিত শুভদৃষ্টি কর।”

তখন পশ্চাৎ হইতে সেই কক্ষের দ্বার উদ্বাচিত হইল। একজন মহাকায় পুরুষ সেই দ্বারপথে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। রাজা কহিলেন,

“হিরণ্ময়ি, ইনিই তোমার স্বামী।”

হিরণ্ময়ী চাহিয়া দেখিলেন—তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল—জাগ্রত স্বপ্নের ভেদজ্ঞানশূন্য হইলেন। দেখিলেন, পুরন্দর!

উভয়ে উভয়কে নিরীক্ষণ করিয়া স্তম্ভিত, উন্মত্তপ্রায় হইলেন। কেহই যেন কথা বিশ্বাস করিলেন না।

রাজা পুরন্দরকে কহিলেন, “সুহৃৎ, হিরণ্ময়ী তোমার যোগ্য পত্নী। আদরে গৃহে লইয়া যাও। ইনি অদ্যাপি তোমার প্রতি পূর্ববৎ স্নেহময়ী। আমি দিব্যরাজি ইহাকে গ্রহণান্তে রাখিয়াছিলাম তাহাতে বিশেষ জানি যে ইনি অনন্যাত্মরাগিনী। তোমার ইচ্ছাক্রমে তাঁহার পরীক্ষা করিয়াছি, আমি তাঁহার স্বামী বলিয়া পবিচয় দিয়াছিলাম, কিন্তু রাজ্যলোভেও হিরণ্ময়ী লুক হইয়া তোমাকে ভুলেন নাই। আপনাকে হিরণ্ময়ীর স্বামী বলিয়া গল্পিত করিয়া ইদিকে জানাইলাম যে হিরণ্ময়ীকে তোমার প্রতি অসৎপ্রণয়ান্তে লইয়া সন্দেহ করি। যদি হির-

গরী তাহাতে দুঃখিতা হইত, 'আনি নিদোষী; আগাকে গ্রহণ করুন' বলিয়া কাতর হইত, তাহা হইলে বৃদ্ধিভাম যে হিরণ্যমী তোমাকে ভুলিয়াছে। কিন্তু হিরণ্যমী তাহা না করিয়া বলিল, 'মহারাজ, আমি কুলটা আমাকে ভাগ করুন।' তিরণ্যমি! তখন কার তোমার মনের ভাব আমি সকলই বৃদ্ধিভাম। তুমি অন্য স্বামীর সংসর্গ করিবে না বলিয়াই আপনাকে কুলটা বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলে। এক্ষণে আশীর্বাদ করি তোমরা সুখী হও।"

হি। মহারাজ! আমাকে আর একটি কথা বৃদ্ধিভাম দিন। ইনি সিংহলে ছিলেন কাশীতে আমার সঙ্গে পরিণত হইল কি প্রকারে? যদি ইনি সিংহল হইতে মে সময় আসিয়াছিলেন, তবে আমরা কেহ জানিলাম না কেন?

রাজা। আনন্দস্বামী এবং পুরন্দরের পিতার পবামর্শ করিয়া সিংহলে লোক পাঠাইয়া ইহাকে সিংহল হইতে একেবারে কাশী লইয়া গিয়াছিলেন, পরে সেইখান হইতে ইনি পুনশ্চ সিংহল গিয়াছিলেন। তান্ত্রলিঙ্গিতে আসেন নাই। এই জন্য তোমরা কেহ জানিতে পার নাই।

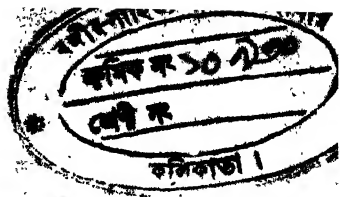
পুরন্দর কহিলেন, "মহারাজ! আপনি যেমন আমার চিত্রকালের মনোরথ পূর্ণ করিলেন, জগদীশ্বর এমনই আপনার সকল মনোরথ পূর্ণ করুন। অর্থাৎ আমি যেমন সুখী হইলাম, এমন সুখী কেহ আপনার রাজ্যে কখন বাস করে নাই।"

সদাশু।



রাধারাণী ।





রাধারানী ।

১

রাধারানী নামে এক বালিকা, মাহেশে রথ দেখিতে গিয়াছিল। বালিকার বয়স একাদশ পরিপূর্ণ হয় নাই। তাহাদিগের অবস্থা পূর্বে ভাল ছিল—বড় মানুষের মেয়ে। কিন্তু তাহার পিতা নাই; তাহার মাতার সঙ্গে একজন জ্ঞাতির একটি মোকদ্দমা হয়; সর্বস্ব লইয়া মোকদ্দমা; মোকদ্দমাটি বিধবা হাইকোর্টে হারিল। সে হারিবামাত্র, ডিক্রীদার জ্ঞাতি ডিক্রী জারি করিয়া ভদ্রামন হইতে উহাদিগকে বাহির করিয়া দিল। প্রায় দশলক্ষ টাকার সম্পত্তি, ডিক্রীদার সকলই লইল। খরচা ও ওয়াশিলাত দিতে নগদ যাহা ছিল, তাহাও গেল; রাধারানীর মাতা, অলঙ্কারাদি বিক্রয় করিয়া, প্রিবিকোর্সিলে একটি আপীল করিল। কিন্তু আর আহারের সংস্থান রহিল না। বিধবা একটি কুটারে আশ্রয় লইয়া, কোন প্রকারে শারীরিক পরিশ্রম করিয়া দিনপাত করিতে লাগিল। রাধারানীর বিবাহ স্মিতে পারিল না।

কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে রথের পূর্বে রাধারানীর মা ঘোরতর পীড়িতা হইল—যে কার্যিক পরিশ্রমে দিনপাত হইত, তাহা বন্ধ হইল। সুতরাং আর আহার চলে না। মাতা ক্রমা, এজন্য কাজে কাজেই তাহার উপবাস; রাধারানীর জুটিল না, বলিয়া উপবাস। রথের দিন তাহার মা একটু বিশেষ হইল, পথের প্রয়োজন হইল, কিন্তু পথ কোথা? কি দিবে?

রাধারানী কাদিতে কাদিতে কতকগুলি বসকুল তুলিয়া,

রাধারাগী ।

তাহার মালা গাঁথিল। মনে করিল যে এই মালা রথের হাতে বিক্রম করিয়া ছই একটি পরমা পাইব, তাহাতেই মার পথ্য ছইবে।

কিন্তু রথের টান অর্ধেক ছইতে না ছইতেই বড় বৃষ্টি আরম্ভ ছইল। বৃষ্টি দেখিয়া লোক সকল ভাঙ্গিয়া গেল। মালা কেহ কিনিল না। রাধারাগী মনে করিল যে আমি একটু না হয় ভিজিলাম—বৃষ্টি থামিলেই আবার লোক জমিবে। কিন্তু বৃষ্টি আর থামিল না। লোক আর জমিল না। সন্ধ্যা ছইল—রাত্রি ছইল—বড় অন্ধকার ছইল—অজ্ঞাত্যা রাধারাগী কঁাদিতে কঁাদিতে কিরিল।

অন্ধকার—পথ কর্দমময়, পিচ্ছিল—কিছুট দেখা যায় না। তাহাতে মুসলধারে শ্রাবণের ধারা বর্ষিতেছিল। মাতার অনা-ভাব মনে করিয়া তদপেক্ষাও রাধারাগীর চক্ষুঃ বারিবর্ষণ করিতেছিল। রাধারাগী কঁাদিতে আছাড় খাইতেছিল—কঁাদিতে উঠিতেছিল—আবার কঁাদিতে আছাড় খাইতেছিল। ছই গণ্ডবিলম্বী ঘন কুম্ভ অলকাবলী বহিয়া, কবরী বহিয়া, বৃষ্টির জল পড়িয়া ভাসিয়া যাইতে ছিল। তথাপি রাধারাগী সেই এক পরমায় বনফুলের মালা বুকে করিয়া রাখিয়াছিল—ফেলে নাই।

এমত সময়ে অন্ধকারে, অকস্মাৎ কে আসিয়া রাধারাগীর ঘাড়ের উপর পড়িল। রাধারাগী এতক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া
~~কঁাদিয়া~~—একণে উচ্চৈঃস্বরে কঁাদিল।

ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল সে বলিল, “কে গা ডাকি কঁাদ ?”

পুরুষমানুষের সঙ্গী—কিন্তু কর্তব্যর গুনিয়া রাধারাগীর রো-দন বন্ধ ছইল। রাধারাগীর চেনা লোক নহে—কিন্তু বড় দয়ালু

লোকের কথা—রাধারানীর ক্ষুদ্র বুদ্ধিটুকুতে ইঁদা বৃষ্টিতে পারি-
ল। রাধারানী রোদন বন্ধ করিয়া বলিল,

“আমি দুঃখিলোকের মেয়ে। আমার কেহ নাই—কেবল
মা আছে।”

সে পুরুষ বলিল, “তুমি কোথা গিয়াছিলে ?”

রা। আমি রথ দেখিতে গিয়াছিলাম। বাড়ী যাইব। কিন্তু
অন্ধকারে, বৃষ্টিতে পথ পাইতেছি না।

পুরুষ বলিল, “তোমার বাড়ী কোথায় ?”

রাধারানী বলিল, “শ্রীরামপুর।”

সে ব্যক্তি বলিল, “আমার সঙ্গে আইস—আমিও শ্রীবামপুর
যাইব। চল, কোন পাড়ায় তোমার বাড়ী—তাহা আমাকে
বলিয়া দিও—আমি তোমাকে বাড়ী রাখিয়া আসিতেছি। বড়
পিছল, তুমি আমার হাত ধর, নহিলে পড়িয়া যাইবে।”

এইরূপে সে ব্যক্তি রাধারানীকে লইয়া চলিল। অন্ধকারে
সে রাধারানীর বয়স অনুমান করিতে পারে নাই, কিন্তু কথার
শ্রবণে বুঝিয়াছিল, যে রাধারানী বড় বালিকা। এখন রাধারানী
তাহার হাত ধরায় হস্তস্পর্শে জানিল, রাধারানী বড় বালিকা।
তখন সে জিজ্ঞাসা করিল যে, “তোমার বয়স কত ?”

রাধা। দশ এগার বছর—

“তোমার নাম কি ?”

রাধা। রাধারানী

“হাঁ রাধারানী ! তুমি ছেলেমানুষ একেলা রথ দেখিতে
গিয়াছিলে কেন ?”

তখন সে, কথায় কথায়, মিষ্ট কথামূলি বলিয়া, সেই এক
পরসার বনফুলের মালার সকল কথাই বাহির করিয়া লইল।
শুনিল, যে গাতার পথের অন্য বালিকা এই মালা গাঁথিয়া

রাধারানী

রথহাটে বেচিতে লইয়া গিয়াছিল—রথ দেখিতে যার মাই—
সে মালাও বিক্রয় হয় মাই—একগেও বলিকার জনসম্মুখে লুকা-
য়িত আছে। তখন সে বলিল, “আমি একছড়া মালা খুঁজিতে
ছিলাম। আমাদের বাড়ীতে ঠাকুর আছে তাঁহাকে পরাইব।
রথের হাট শীঘ্র ভাঙ্গিয়া গেল—আমি তাই মালা কিনিতে পারি
নাই। তুমি মালা বেচ ত আমি কিনি।”

রাধারানীর আনন্দ হইল, কিন্তু মনে ভাবিল যে, আমাকে
যে এত যত্ন করিয়া হাত ধরিয়া, এ অন্ধকারে বাড়ী লইয়া যাই-
তেছে, তাহার কাছে দাম লইব কি প্রকারে? তা, নহিলে,
আমার মা খেতে পাবে না। তা নিই।

এই ভাবিয়া রাধারানী, মালা, সমভিব্যাহারীকে দিল। সম-
ভিব্যাহারী বলিল, “ইহার দাম চারি পয়সা—এই লও।”
সমভিব্যাহারী এই বলিয়া মূল্য দিল। রাধারানী বলিল, “এ
কি পয়সা? এ যে বড় ঠেক্চে।”

“ডবল পয়সা—দেখিতেছ না ছুইটা বৈ দিই নাই।”

রাধা। তা এ যে অন্ধকারেও চক্চক্ কর্চে। তুমি ভুলে
টাকা দাও নাই ত?

“না। নূতন কলের পয়সা, তাই চক্ চক্ কর্চে।”

রাধা। তা, আচ্ছা ঘরে গিয়ে, প্রদীপ জেলে যদি দেখি,
যে পয়সা নয়, তখন ফিরাইয়া দিব। তোমাকে সেখানে একটু
দাঁড়াইতে হইবে।

কিছু পরে তাহার রাধারানীর মার কুটারধারে, আসিয়া
উপস্থিত হইল। সেখানে গিয়া, রাধারানী বলিল, “তুমি ঘরে
আসিয়া দাঁড়াও, আমরা আলো আলিয়া দেখি টাকা কি
পয়সা।”

লক্ষী বলিল, “আমি বাহিরে দাঁড়াইয়া আছি । তুমি আগে ভিজা কাপড় ছাড়—তার পর প্রার্থনা জ্বালিও ।”

রাধারানী বলিল, “আমার আর কাপড় নাই—একখানি ছিল, তাহা কাচিতে দিয়াছি । তা, আমি ভিজা কাপড়ে সর্ব্বদা থাকি, আমার ব্যামো হয় না । আঁচলটা নিঙড়ে পরিব এখন । তুমি দাঁড়াও আমি আলো জ্বালি ।”

“আচ্ছা ।”

যত্নে তৈল ছিল না, স্তত্রাং চালের খড় পাড়িয়া, চকমকি চুকিয়া, আগুন জ্বালিতে হইল । আগুন জ্বালিতে কাজে কাজেই একটু বিলম্ব হইল । আলো জ্বালিয়া, রাধারানী দেখিল, টাকা বটে, পয়সা নহে ।

তখন রাধারানী বাহিরে আসিয়া আলো ধরিয়া তন্নাস করিয়া দেখিল, যে যে টাকা দিয়াছে, সে নাই—চলিয়া গিয়াছে ।

রাধারানী তখন বিষন্নবদনে, সকল কথা তাহার মাঝে বলিয়া, মুখপানে চাহিয়া রহিল—সকাতরে বলিল—“মা ! এখন কি হবে ?”

মা বলিল, “কি হবে বাছা ! সে কি আর না জেনে টাকা দিরেছে । সে দাতা, আমাদের দুঃখ গুনিয়া দান করিয়াছে—আমরাও ভিখারী হইয়াছি—দানগ্রহণ করিয়া খরচ করি ।”

তাহারা এইরূপ কথাবার্তা কহিতেছিল, এমনত সময়ে কে আসিয়া তাহাদের কুটারের আগড় ঠেলিয়া বড় সোর গোল উপস্থিত করিল । রাধারানী দ্বার খুলিয়া দিল—মনে করিয়াছিল যে সেই তিনিই বৃষ্টি আবার ফিরিয়া আসিয়াছেন । পোড়া কপাল ! তিনি কেন ? পোড়ার মুখো কাপুড়ে মিন্‌সে !

রাধারানীর মার কুটার, বাজারের অনতিদূরে । তাহাদের কুটারের নিকটেই পদ্মলোচন শাহার কাপড়ের দোকান ।

লোচন খোদ,—সেই পোড়ার মুখো কাপড়ে মিলে—একজোড়া
নূতন কুঞ্জনার শাস্ত্রিগুরে কাপড় হাতে করিয়া আনিয়াছিল,
এখন হার খোলা পাইয়া তাহা রাধারানীকে দিল । বলিল,
“রাধারানীর এই কাপড় ।”

রাধারানী বলিল, “ওমা ! আমার কিসের কাপড় !”

পদ্মলোচন—সে বাস্তবিক পোড়ার মুখো কি না, তাহা
আমরা সবিশেষ জানি না—রাধারানীর কথা শুনিয়া কিছু বিস্মিত
হইল । বলিল, “কেন, এই যে এক বাবু এখনই আমাকে
নগদ দাম দিয়া বলিয়া গেল, যে এই কাপড় এখনই ঐ রাধা-
রানীকে দিয়া এস ।”

রাধারানী তখন বলিল, “ওমা সেই গো ! সেই । তিনিই
কাপড় কিনে পাঠিয়ে দিয়েছেন । হাগাঁ, পদ্মলোচন !”—

রাধারানীর পিতার সময় হইতে পদ্মলোচন ইহাদের কাছে
সুপরিচিত—অনেক বারই ইহাদিগের নিকট, যখন সুদিন
ছিল, তখন, চারি টাকার কাপড়ে শপথ করিয়া আট টাকা
সাড়ে বার আনা, আর দুই আনা মুনকা লইয়াছিলেন—

“হাঁ পদ্মলোচন—বলি সে বাবুটিকে চেন ?” পদ্মলোচন
বলিল, “তোমরা চেন না ?”

রাধা । না ।

পদ্ম । আমি বলি তোমাদের কুটুম্ব । আমি চিনি না ।

যাহা হোক, পদ্মলোচন চারি টাকার কাপড় আবার মাত্র
মুনকা আট টাকা সাড়ে চৌদ্দ আনার বিক্রয় করিয়াছিলেন,
আর অধিক কপা কহিবার প্রয়োজন নাই বিবেচনা করিয়া
প্রহরমনে দোকানে ফিরিয়া গেলেন ।

এদিকে রাধারানী, প্রাপ্ত টাকা ভাঙ্গাইয়া মার পাথোর
উদ্যোগের জন্য স্নানকারে গেল । বাস্তব করিয়া, তৈল আনিয়া

প্রদীপ জালিল। আর অন্য যৎকিঞ্চিৎ রক্ষন করিল। স্থান পরিষ্কার করিয়া, মাকে অন্ন দিবে, এই অঙ্গিপ্রার্থে ঘর কাঁটাইতে লাগিল। কাঁটাইতে একখানা কাগজ কুড়াইয়া পাইল—হাতে করিয়া তুলিল—“এ কি মা!”

মা, দেখিয়া বলিলেন—একখানা নোট ।

রাধারাণী বলিল, “তবে তিনি ফেলিয়া গিয়াছেন।”

মা, বলিলেন, “হাঁ। তোমাতে দিয়া গিয়াছেন। দেখ, লেখা আছে ‘রাধারাণীর জন্য।’”

রাধারাণী বলিল, “হাঁ মা, এমন লোক কে মা!”

মা বলিলেন, “তাঁহার নামও নোটে লেখা আছে। পাছে কেহ চোরা নোট বলে, এই জন্য নাম লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নাম রুঙ্গিনীকুমার রায়।”

পরদিন, মাতায় কন্যায়, রুঙ্গিনীকুমার রায়ের অনেক সন্ধান করিল। কিন্তু শ্রীরামপুরে, বা নিকটবর্তী কোন স্থানে রুঙ্গিনীকুমার রায়, কেহ আছে, এমনত কোন সন্ধান পাইল না। নোটখানি তাহারা ভাঙাইল না—তুলিয়া রাখিল—তাহারা দানিষ্ট, কিন্তু লোভী নহে।

২

রাধারাণীর মাতা পথা করিলেন বটে, কিন্তু সে রোগহইতে মুক্তি পাওয়া, তাঁহার অদৃষ্টে ছিল না। তিনি অতিশয় ধনী ছিলেন, এখন অতি দুঃখিনী হইয়াছিলেন; এই শারীরিক এবং মানসিক দ্বিবিধ কষ্ট, তাঁহার সহ্য হইল না। যোগ ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া, তাঁহার শেষকাল উপস্থিত হইল।

এমত সময়ে, বিলাত হইতে সন্বাদ আসিল যে প্রিবি কোমিসলের আপীলে তাঁহার পক্ষে নিষ্পত্তি পাইয়াছে; তিনি

আপন সম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন, ওরাশিলাত্তের টাকা ফেরৎ পাইবেন, এবং তিন আদালতের খরচা পাইবেন। কামাখ্যানাথ বাবু তাঁহার পক্ষে হাইকোর্টে উত্তীর্ণ ছিলেন, তিনি স্বয়ং এই সন্যাস লইয়া রাধারাণীর মাতার কুর্টারে উপস্থিত হইলেন। স্নস্বাদ শুনিয়া, রুগ্নার অবিরল নয়নাঙ্ক পড়িতে লাগিল।

তিনি নয়নাঙ্ক সঞ্চরণ করিয়া কামাখ্যা বাবুকে বলিলেন, “যে প্রদীপ নিবিয়াছে, তাহাতে তৈল দিলে কি হইবে? আপনার এ স্নস্বাদেও আমার আর প্রাণরক্ষা হইবে না। আমার আয়ুঃশেষ হইয়াছে। তবে আমার এই স্নস্ব, যে রাধারাণী আর অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবে না। তাই বা কে জানে? সে বালিকা, তাহার এ সম্পত্তি কে রক্ষা করিবে? কেবল আপনাই ভরসা। আপনি, আগার এই অস্তিমকালে আমারে একটি ভিক্ষা দিউন—নহিলে আর কাহার কাছে চাহিব।”

কামাখ্যা বাবু অতি ভদ্র লোক। এবং তিনি রাধারাণীর পিতার বন্ধু ছিলেন। রাধারাণীর মাতা দুর্দশাগ্রস্ত হইলে, তিনি রাধারাণীর মাতাকে বলিয় ছিলেন, যে যতদিন না আপীল নিষ্পত্তি পায়, অন্ততঃ ততদিন তোমরা আসিয়া আমার গৃহে অবস্থান কর, আমি আপনার মাতার মত তোমাকে রাখিব। রাধারাণীর মাতা তাহাতে অস্বীকৃতা হইয়াছিলেন। পরিশেষে কামাখ্যাবাবু কিছু কিছু মাসিক সাহায্য করিতে চাহিলেন। “আমার এখনও কিছু হাতে আছে—আরশ্যক হইলে চাহিয়া লইব।” এইরূপ মিথ্যা কথা বলিয়া রাধারাণীর মাতা সে সাহায্য গ্রহণে অস্বীকৃতা হইয়াছিলেন। কল্পিনীকুমারের দান-গ্রহণ, তাহানিগের প্রথম ও শেষ দানগ্রহণ।

কামাখ্যাবাবু এতদিন ব্যস্ত হইতে পারেন নাই, যে তাঁহার

এরূপ হৃদশাগ্রস্ত হইয়াছেন। দশা দেখিয়া, কামাখ্যা বাবু অত্যন্ত কাতর হইলেন। আবার রাধারাণীর মাতা, বুকুরে তাঁহার কাছে তিক্কা চাহিতেছেন, দেখিয়া আরও কাতর হইলেন। বলিলেন,

“আপনি আঞ্জা করুন, আমি কি করিব? আপনার যাহা প্রয়োজন, আমি তাহাই করিব।”

রাধারাণীর মাতা বলিলেন, “আমি চলিলাম, কিন্তু রাধারাণী রহিল। এক্ষণে আদালত হইতে আমার খণ্ডরের যথার্থ উইল সিদ্ধ হইয়াছে, অতএব রাধারাণী একা সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হইবে। আপনি তাহাকে দেখিবেন, আপনার কন্যায় ন্যায়, তাহাকে রক্ষা করিবেন। এই আমার তিক্কা। আপনি এই কথা স্বীকার করিলেই আমি স্মৃতে মরিতে পারি।

কামাখ্যা বাবু বলিলেন, “আমি আপনার নিকট শপথ করিতেছি, আমি রাধারাণীকে আপন কন্যার অধিক যত্ন করিব। আমি কারমনোবাকো এ কথা কহিলাম, আপনি বিশ্বাস করুন।”

যিনি মুমূর্ষু তিনি, কামাখ্যা বাবুর চক্ষের জল দেখিয়া, তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিলেন। তাঁহার সেই শীর্ণ গুহ অধরে একটু আফ্লাদের হাসি দেখা দিল। হাসি দেখিয়া কামাখ্যা বাবু বুঝিলেন, ইনি আর বাঁচিবেন না।

কামাখ্যা বাবু তাঁহাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন, যে এক্ষণে আমার গৃহে চলুন। পরে ভদ্রাসন মঞ্চল হইলে আসিবেন। রাধারাণীর মাতার যে অহঙ্কার, সে দারিদ্র্যজনিত—এজন্য দারিদ্র্যাবস্থার তাঁহার গৃহে যাইতে চাহেন নাই। এক্ষণে আর দারিদ্র্য নাই, সুতরাং আর সে অহঙ্কারও নাই। এক্ষণে তিনি যাইতে সম্মত হইলেন। কামাখ্যা বাবু, রাধারাণী ও তাহার মাতাকে সবঙ্গে নিজালয়ে লইয়া গেলেন।

তিনি রীতিমত পীড়িতার চিকিৎসা করাইলেন। কিন্তু তাঁহার জীবন রক্ষা হইল না, অল্পদিনেই তাঁহার মৃত্যু হইল।

উপযুক্ত সময়ে কামাখ্যা বাবু রাধারাণীকে তাঁহার সম্পত্তি দখল দেওয়াইলেন। কিন্তু রাধারাণী বালিকা বলিয়া তাহাকে নিজবাটীতে একা থাকিতে দিলেন না, আপন গৃহেই রাখিলেন। কালেক্টর সাহেব, রাধারাণীর সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডেসের অধীনে আনিবার জন্য যত্ন পাইলেন, কিন্তু কামাখ্যা বাবু বিবেচনা করিলেন, আমি রাধারাণীর জন্য যতদূর করিব, সরকারি কর্মচারিগণ ততদূর করিবে না। কামাখ্যাবাবুর কৌশলে কালেক্টর সাহেব নিরস্ত হইলেন। কামাখ্যা বাবু স্বয়ং রাধারাণীর সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন।

বাঁকি রাধারাণীর বিবাহ। কিন্তু কামাখ্যাবাবু নব্যতন্ত্রের লোক—বাল্যবিবাহে তাঁহার ঘৃণা ছিল। তিনি বিবেচনা করলেন, যে রাধারাণীর বিবাহ তাড়াতাড়ি না দিলে, জাতি গেল মনে করে, এমত কেহ তাহার নাই। অতএব যবে রাধারাণী, স্বয়ং বিবেচনা করিয়া বিবাহে ইচ্ছুক হইবে, তবে তাহার বিবাহ দিব। এখন সে লেখাপড়া শিখুক।

এই ভাবিয়া কামাখ্যাবাবু রাধারাণীর বিবাহের কোন উদ্যোগ না করিয়া, তাহাকে উত্তমরূপে সুশিক্ষিতা করাইলেন।

৩

পাঁচ বৎসর গেল—রাধারাণী পরম সুন্দরী যোড়শবর্ষীয়া কুমারী। কিন্তু সে অন্তঃপুরমধ্যে বাস করে, তাহার সে রূপরশি কেহ দেখিতে পায় না। একদেবে রাধারাণীর সম্বন্ধ করবার সময় উপস্থিত হইল। কামাখ্যাবাবুর ইচ্ছা, রাধারাণীর মনের কথা বুঝিয়া তাহার সম্বন্ধ করেন। তবু জানিবার জন্য আপনার কন্যা, বনকুমারীকে ডাকিলেন।

বসন্তের সঙ্গে, রাধারানীর সখীত্ব । উভয়ে সর্ববয়স্ক ।
এবং উভয়ে অত্যন্ত প্রেময় । কামাখ্যাবাবু বসন্তকে আপনার
মনোহরত কথা বুঝাইয়া বলিলেন ।

বসন্ত, সলজ্জভাবে, অথচ অল্প হাসিতে হাসিতে পিতাকে
জিজ্ঞাসা করিল,

“ রুশ্বিনীকুমার রায় কেহ আছে ? ”

কামাখ্যাবাবু বিস্মিত চইয়া বলিলেন, “ না । তা ত জানি
না । কেন ? ”

বসন্ত বলিল, “ রাধারানী রুশ্বিনীকুমার ভিন্ন আর কাহাকেও
বিবাহ করিবে না । ”

কামাখ্যা । সে কি ? রাধারানীর সঙ্গে অন্য ব্যক্তির পরিচয়
কি প্রকারে হইল ?

বসন্ত অবনতমুখে অল্প হাসিল । সে রপের রাত্রে নিবরণ
সবিস্তারে রাধারানীর কাছে শুনিয়াছিল, পিতার সাক্ষাতে সকল
বিবৃত করিল । শুনিয়া কামাখ্যা বাবু রুশ্বিনীকুমারের প্রশংসা
করিয়া বলিলেন,

“ রাধারানীকে বুঝাইয়া বলিও, রাধারানী একটি মহা ভ্রমে
পড়িয়াছে । বিবাহ কৃতজ্ঞতা অল্পসারে কর্তব্য নহে । রুশ্বিনী-
কুমারের নিকট রাধারানীর কৃতজ্ঞ হওয়াই উচিত ; যদি সময়
ঘটে, তবে অবশ্য প্রত্নাপকার করিতে হইবে । কিন্তু বিবাহে
রুশ্বিনীকুমারের কোন দাবি দাওয়া নাই । তাতে আবার সে
কি জাতি, কত বয়স তাহা কেহ জানে না । তাহার পরিবার
সন্তানাদি থাকিবারই সম্ভাবনা ; রুশ্বিনীকুমার বিবাহ করিবারই
বা সম্ভাবনা কি ? ”

বসন্ত বলিল, “ সম্ভাবনা কিছুই নাই, তাহাও রাধারানী
বিলক্ষণ বুঝিয়াছে । কিন্তু সে সেই রাজি অবধি, রুশ্বিনীকুমারের ”

একটি মানসিক প্রতিমা গড়িয়া, আপনার মনে তাহা স্থাপিত করিয়াছে। যেমন দেবতাকে লোকে পূজা করে, রাধারাণী সেই প্রতিমা তেমনি করিয়া, প্রত্যহ মনে মনে পূজা করে। এই পাঁচ বৎসর রাধারাণী আমাদিগের বাড়ী আসিয়াছে, এই পাঁচ বৎসরে এমন দিন প্রায় যায় নাই, যে দিন রাধারাণী রুক্মিণীকুমারের কথা আমার সাক্ষাতে একবারও বলে নাই। আর কেহ রাধারাণীকে বিবাহ করিলে, তাহার স্বামী সুখী হইবে না।”

কামাখ্যাবাবু মনে মনে বলিলেন, “ বাতিক। ইহার একটু চিকিৎসা আবশ্যিক। কিন্তু প্রথম চিকিৎসা বোধ হয়, রুক্মিণীকুমারের সন্ধান করা।”

কামাখ্যাবাবু, রুক্মিণীকুমারের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। পরঃ কলিকাতায় তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। বন্ধুবর্গকেও সেই সন্ধানে নিযুক্ত করিলেন। দেশে দেশে আপনার মোবাক্লেগণকে পত্র লিখিলেন। প্রতি সম্বাদপত্রেও বিজ্ঞাপন দিলেন। সে বিজ্ঞাপন এইরূপ—

“ বাবু রুক্মিণীকুমার রায়, নিম্ন স্বাক্ষরকারী ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন—বিশেষ প্রয়োজন আছে। ইহাতে রুক্মিণী বাবুর সম্বোধের ব্যতীত অসম্বোধের কারণ উপস্থিত হইবে না।

শ্রী ইত্যদি—”

কিন্তু কিছুতেই রুক্মিণীকুমারের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। দ্বিম গেল, মাস গেল, বৎসর গেল তথাপি কই, রুক্মিণীকুমার ত আসিল না।

ইহার পর, রাধারাণীর আর একটি ঘোরতর বিপদ উপস্থিত হইল—কামাখ্যা বাবুর লোকান্তরগতি হইল। রাধারাণী ইহাতে

অত্যন্ত শোকাতুরা হইলেন, দ্বিতীয়বার পিতৃহীনা হইলেন, মনে করিলেন। কামাখ্যা বাবুর আত্মাঙ্গির পর, রাধারানী, আপন বাটতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এবং নিম্ন সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণা স্বয়ং করিতে লাগিলেন। কামাখ্যা বাবুর বিচক্ষণতা হেতু, রাধারানীর সম্পত্তি বিস্তর বাড়িয়াছিল।

বিষয় হস্তে লষ্টয়াই, রাধারানী প্রথমেই দুই লক্ষ মুদ্রা গবর্ণমেন্টে প্রেরণ করিলেন। তৎসঙ্গে এই প্রার্থনা করিলেন, যে এই অর্থে তাঁহার নিজগ্রামে, একটি অনাথনিবাস স্থাপিত হউক। তাহার নাম হোক—“রুস্মিণীকুমারের প্রসাদ।”

গবর্ণমেন্টের কম্পচারিগণ প্রস্তাবিত নাম শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন, কিন্তু তাহাতে কে কথা কহিবে? অনাথনিবাস সংস্থাপিত হইল। রাধারানীর মাতা দরিদ্রাবস্থায় নিজগ্রাম ত্যাগ করিয়া, শ্রীরামপুরে কুটির নির্মাণ করিয়াছিলেন, কেন না যে গ্রামে যে ধনী ছিল, সে সহসা দরিদ্র হইলে, সে গ্রামে তাহার বাস করা কষ্টকর হয়। তাঁহাদিগের নিজগ্রাম শ্রীরামপুর হইতে কিকিৎ দূর—আমরা সে গ্রামকে রাজপুর বলিব। এক্ষণে রাধারানী রাজপুরেই বাস করিতেন। অনাথনিবাসও রাধারানীর বাড়ীর সম্মুখে, রাজপুরে সংস্থাপিত হইল। নানা দেশ হইতে দীন দুঃখী অনাথ আসিয়া তথায় বাস করিতে লাগিল।

৪

দুই এক বৎসর পরে, একজন ভদ্র লোক, সেই অনাথনিবাসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বয়স ৩৫।৩৬ বৎসর। অবস্থা ক্ষেত্রিয়া, অতি ধীর, গভীর, এবং অর্ধশালী লোক বোধ হয়। তিনি সেই “রুস্মিণীকুমারের প্রসাদের” দ্বারা আসিয়া পাড়াইলেন। রক্ষকগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ কাহার বাড়ী?”

তাহারা বলিল, “এ কাহারও বাড়ী নহে। এখানে হুঃখী অনাথ লোক থাকে। ইহাকে “রুশ্বিনীকুমারের প্রসাদ বলে।”

আগন্তুক বলিলেন, “আমি ইহার ভিতরে গিয়া দেখিতে পারি ?”

রক্ষকগণ বলিল, “দীন হুঃখীলোকেও ইহার ভিতর অনা-
রাসে বাইতেছে—আপনাকে নিষেধ কি ?”

দর্শক ভিতরে গিয়া সব দেখিয়া, প্রত্যাবর্তন করিলেন।
বলিলেন,

“বন্দবস্ত দেখিয়া, আগার বড় আশ্লাদ হইয়াছে। কে এই
অন্নচ্ছত্র দিয়াছে ? রুশ্বিনীকুমার কি তাঁহার নাম ?”

রক্ষকেরা বলিল, “শ্রীমতী রাধারানী দাসী এই অন্নচ্ছত্র
দিয়াছেন।”

দর্শক জিজ্ঞাসা করিলেন, “তবে ইহাকে রুশ্বিনীকুমারের
প্রসাদ বলে কেন ?”

রক্ষকেরা বলিল, “তাহা আমরা কেহ জানি না।”

“রুশ্বিনীকুমার কার নাম ?”

“কাহারও নয়।”

“যে রাধারানী দাসীর নাম করিলে, তাঁহার নিম্নাস কোথায় ?”

রক্ষকেরা, সম্মুখে অতি বৃহৎ অট্টালিকা দেখাইয়া দিল।

আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, “তোমরা বলিতে পার,
এই রাধারানী সখবা না বিধবা ?”

উত্তর “সখবাও নন—বিধবাও নন—উনি বিবাহ করেন
নাই। বড় মাহুষের মেয়ে—উঁহার কেহ নাই—কে বিবাহ
দিবে ?”

প্রশ্ন—“উনি পুরুষ মাহুষের সাক্ষাতে বাহির হইয়া থাকেন ?
রাগ করিও না—এখন অনেক বড় মাহুষের মেয়ে মেম লোকের

মত বাহিরে বাহির হইয়া থাকে, এই জন্যই জিজ্ঞাসা করিতেছি।”

রক্ষকেরা উত্তর করিল—“ইনি সেক্সপ চরিত্রের নন। পুরুষের সমক্ষে বাহির হন না।”

প্রশ্নকর্তা ধীরে ধীরে রাধারানীর অট্টালিকার অভিমুখে গিয়া, উন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

৫

যিনি আসিয়াছিলেন, তাঁহার পরিচ্ছদ সচরাচর বাঙ্গালি ভদ্রলোকের মত; বিশেষ পারিপাট্য, অথবা পারিপাটোর বিশেষ অভাবও কিছু ছিল না, কিন্তু তাঁহার অঙ্গুলিতে একটা হীরকাসুরীয় ছিল; তাহা দেখিয়া, রাধারানীর কন্দকারকণণ অবাক হইয়া তৎপ্রতি চাহিয়া রহিল; এত বড় হীরা তাহারা কখন অঙ্গুরীয়ে দেখে নাই। তাঁহার সঙ্গে কেহ লোক ছিল না, এজন্য তাহারা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না যে, কে ইনি? মনে করিল বাবু স্বয়ং পরিচয় দিবেন, কিন্তু বাবু কোন পরিচয় দিলেন না। তিনি রাধারানীর দেওয়ান্জির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার হস্তে একখানি পত্র দিলেন, বলিলেন,

“এই পত্র আপনার মুনিবের কাছে পাঠাইয়া দিয়া, আমাকে উত্তর আনিয়া দিন।”

দেওয়ান্জি বলিলেন, “আমার মুনিব স্ত্রীলোক অবিবাহিতা, আবার অল্পবয়স্কা। এজন্য তিনি নিম্নম করিয়াছেন, যে কোন অপরিচিত লোকে পত্র আনিলে, আমরা তাহা না পড়িয়া তাঁহার কাছে পাঠাইব না।”

আগন্তুক বলিল, “আপনি পড়ুন।”

দেওয়ান্জি পত্র পড়িলেন—

“প্রিয় জগিনি!”

“একাক্তি পুরুষ হইলেও ইহার সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিও—কর করিও না। যেমতৎ ঘটে আমাদের লিখিও।

শ্রীমতী বসন্তকুমারী ।”

কামাখ্যা বাবুর কন্যার স্বাক্ষর দেখিয়া, কেহ আর কিছু বলিল না—পত্র অস্তঃপুরে গেল।

অস্তঃপুর হইতে পরিচারিকা, পত্রবাহক বাবুকে লইতে আসিল। আর কেহ সঙ্গে যাইতে পাইল না—হুকুম নাই।

পরিচারিকা, বাবুকে লইয়া এক সুসজ্জিত গৃহে বসাইলেন। রাধারাণীর অস্তঃপুরে সেই প্রথম পুরুষ মানুষ প্রবেশ করিল। দেখিয়া, একজন পরিচারিকা রাধারাণীকে ডাকিতে গেল, আর একজন অস্ত্রাঙ্গে থাকিয়া আগন্তুককে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। দেখিল, যে তাঁহার বর্ণটুকু গৌর—ক্ষুণ্ণ মল্লিকা-রাশির মত গৌর; তাঁহার শরীর দীর্ঘ, এবং জঁষৎ স্থূল; কপাল দীর্ঘ; অতি সুন্দর পরিষ্কার ঘনকৃষ্ণ সুরঞ্জিত কেশজালে মণ্ডিত; চক্ষু বৃহৎ, কটাক্ষ স্থির, জ্রয়ুগ সুন্দর, ঘন, দূরায়ত, এবং নিবিড়-কৃষ্ণ; নাসিকা দীর্ঘ, এবং উন্নত, ওষ্ঠাধর রক্তবর্ণ, ক্ষুদ্র, এবং কোমল; গ্রীবা, দীর্ঘ, অগ্ৰচ মাংসল; অন্যান্য অঙ্গ বস্ত্রে আচ্ছাদিত, কেবল অঙ্গুলিগুলি দেখা যাইতেছে, সেগুলি শুভ্র, সুগঠিত, এবং একটি বৃহদাকার হীরকে রঞ্জিত।

রাধারাণী সেই স্থানে আসিয়া পরিচারিকা বিদায় করিয়া দিলেন। রাধারাণী আসিবামাত্র দর্শকের বোধ হইল যে সেই কক্ষমধ্যে এক অভিনব সূর্য্যোদয় হইল—রূপের আলোকে তাঁহার মস্তকের কেশ পর্য্যন্ত যেন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

আগন্তকের উচিত প্রথম কথা কহা—কেন না তিনি পুরুষ এবং বয়োজ্যেষ্ঠ—কিন্তু তিনি সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া মিস্ত্রক হইয়া রহিলেন। রাধারাণী একটু অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,

“আপনি একরূপ গোপনে আমার সঙ্গে সাক্ষাতের অভিলাষ করিয়াছেন কেন ? আমি জীলোক, কেবল বসন্তের অছুরোধেই আমি ইহা স্বীকার করিয়াছি ।”

আগন্তুক বলিল, “আমি আপনার সহিত একরূপ সাক্ষাতের অভিলাষী হইয়াছি, ঠিক তা নহে ।”

রাধারাণী অপ্রতিভ হইলেন । বলিলেন, “তা নয়, বটে । তবে বসন্ত কি অন্য একরূপ অছুরোধ করিয়াছেন, তাহা কিছু লেখেন নাই । বোধ হয় আপনি জানেন ।”

আগন্তুক, একখানি অতি পুরাতন সখাদপত্র বাহির করিয়া তাহা রাধারাণীকে দেখাইলেন । রাধারাণী পড়িলেন ; কামাখ্যাবাবুর স্বাক্ষরিত রুক্মিণীকুমারের সেই বিজ্ঞাপন ! রাধারাণী, দাঁড়াইয়াছিলেন—দাঁড়াইয়াই নারিকেল পত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন । আগন্তুকের দেবতুল্য গঠন দেখিয়া, মনে ভাবিলেন, ইনিই আমার সেই রুক্মিণীকুমার । আর থাকিতে পারিলেন না—জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, “আপনার নাম কি রুক্মিণীকুমার বাবু !”

আগন্তুক বলিলেন, “না ।” “না” শব্দ শুনিয়াই, রাধারাণী, স্বীবেৎ আসনগ্রহণ করিলেন । আর দাঁড়াইতে পারিলেন না—তাঁহার বুক যেন ভাঙ্গিয়া গেল । আগন্তুক বলিলেন, “না । আমি যদি রুক্মিণীকুমার হইতাম—তাহা হইলে, কামাখ্যা বাবু এই বিজ্ঞাপন দিতেন না । কেন না, তাঁহার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল । কিন্তু যখন এই বিজ্ঞাপন বাহির হয় তখনই আমি ইহা দেখিয়া তুলিয়া রাখিয়াছিলাম ।”

রাধারাণী বলিল, “যদি আপনার সঙ্গে এই বিজ্ঞাপকের কোন সম্বন্ধ নাট, তবে আপনি ইহা তুলিয়া রাখিয়াছিলেন কেন ?”

উত্তরকারী বলিলেন, “একটি কৌতূকের জন্য । আজি আট দশ বৎসর হইল, আমি যেখানে সেখানে বেড়াইতাম—কিন্তু লোকলজ্জাভয়ে আপনার নামটি গোপন করিয়া কাল্পনিক নাম ব্যবহার করিতাম । কাল্পনিক নামটি রুশ্বিনীকুমার । আপনি অত বিমনা হইতেছেন কেন ?”

রাধারাণী একটু স্থির হইলেন—আগন্তুক বলিতে লাগিলেন—“যথার্থ রুশ্বিনীকুমার নাম ধরে, এমন কাহাকেও চিনি না । যদি কেহ আমারই তল্লাস কবিয়া থাকে—তাহা সম্ভবনহে—তথাপি কি জানি—সাত পাঁচ ভাবিয়া বিজ্ঞাপনটি তুলিয়া রাখিলাম—কিন্তু কামাখ্যা বাবুর কাছে আসিতে সাহস হইল না ।”

“পরে ?”

“পরে কামাখ্যা বাবুর শ্রাদ্ধে ঠাঁহার পুত্রগণ আমাকে নিমন্ত্রণ করিল, কিন্তু আমি কার্য্যগতিকে আসিতে পারি নাই । সম্প্রতি সেই ক্রটির ক্ষমাপ্রার্থনার জন্য ঠাঁহার পুত্রদিগের নিকট আসিলাম । কৌতুক বশতঃ বিজ্ঞাপনটি সঙ্গে আনিয়াছিলাম । প্রসঙ্গ ক্রমে ঠাঁহার কথা উত্থাপন করিয়া কামাখ্যা বাবুর স্ফোৰ্ত্ত-পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, এ বিজ্ঞাপন কেন দেওয়া হইয়াছিল ? কামাখ্যা বাবু বলিলেন, যে রাধারাণীর অনুরোধে । আমিও এক রাধারাণীকে চিনিতাম—এক বালিকা—আমি একদিন দেখিয়া তাহাকে আর ভুলিতে পারিলাম না । সে মাতার পথ্যের জন্য, আপনি অনাহারে থাকিয়া বনফুলব মালা গাঁথিয়া—সেই অঙ্গকার বৃষ্টিতে—”বস্ত্র আর কথা কহিতে পারিলেন না—ঠাঁহার চক্ষু জলে পুরিয়া গেল । রাধারাণীরও চক্ষু জলে ভাসিতে লাগিল । চক্ষু মুছিয়া রাধারাণী বলিল,

“সে পোড়ারমুখীর কথায় এখন প্রয়োজন কি ? আপনার কথা বলুন ।”

আগন্তুক উত্তর করিলেন, “তাহাকে গালি দিবেন না। যদি সংসারে কেহ সোনারুখী থাকে, তবে সেই রাধারানী। যদি কাহাকে পবিত্র সরলচিত্ত, এ সংসারে আমি দেখিয়া থাকি, তবে সেই রাধারানী—বদী কাহারও কথায় অমৃত থাকে, তবে সেই রাধারানী—বপার্থ অমৃত ! বর্ণে বর্ণে অপ্সরার বীণা বাজে যেন কথা কহিতে বাধত করে, অণচ সকল কথা, পথিকার সুখধুর,—অতি সবল ! আমি এমন কণ্ঠ কখন শুনি নাই—এমন কথা কখনও শুনি নাই।”

রুক্মিণীকুমার—এক্ষণে ইচ্ছাকে রুক্মিণীকুমারই বলা বাঞ্ছিত—
—ঐ সঙ্গে মনে বলিলেন, “আবার আজ বুঝি তেমনি কণ্ঠ শুনিতেছি।”

রুক্মিণীকুমার মনে ভাবিতেছিলেন, আজি এতদিন হইল যে সেই বালিকার কণ্ঠস্বর শুনিয়াছিলাম কিন্তু আজিও সে আমার মনের ভিতর জাগিতেছে ! যেন কাল শুনিয়াছি অণচ আজি এই বাধারানীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া আমার সেট রাধারানী বাণীকেই বা মনে পড়ে কেন ? এই কি সেই ? আমি মুখ কোণায় সেই দীনভঃখিনী কুটুম্বিনী ভিখাবিনী, আর কোণায় এত উচ্চপ্রাসাদবিহারিণী ইন্দ্রাণী । আমি সে রাধারানীর অঙ্ককাবে ভাল কথিয়া দেখিতে পাই নাই, সুতবাং জানি যে সে সুন্দরী কি কুংসিতা, কিন্তু এই শচীনিকিতা রূপশত্যাংশের একাংশ রূপও যদি তাহাব থাকে, তাহা হইলে মোক লোকমনোমোহিনী বটে ।

এ দিকে বাধারানী, অতৃপ্তশ্রবণে রুক্মিণীকুমারের মধুর কণ্ঠ শুনি শুনিতেছিলেন—মনে মনে ভাবিতেছিলেন, তুমি পাপিষ্ঠা রাধারানীকে বলিতেছ, কেবল তোমাকেই সেই কণ্ঠ শুনি বলা যায় ! তুমি আজ আট বৎসরের গর রাধারানী

সবার জন্য কোন নন্দনকানন ছাড়িয়া পৃথিবীতে নামিলে ?
কি দিনে কি আমার হৃদয়ের পূজায় প্রীত হইয়াছ ? তুমি কি
স্বামী ? নাহিলে আমি লুকাইয়া, হৃদয়ের ভিতরে লুকাইয়া
আমাকে যে পূজা করি, তাহা তুমি কি প্রকারে জানিলে ?

এই প্রথম, ছইজনে, স্পষ্ট দিবসালোকে, পরস্পরের প্রতি
স্মৃতি পাত করিলেন । ছইজনে, ছইজনের মুখপানে চাহিয়া
বসিতে লাগিলেন, আর এমন আছে কি ? এই সমাগরা
নদীচিজিতা, জীবসকুলা পৃথিবীতলে, এমন তেজোময়, এমন
সুখময়, এমন চঞ্চল অথচ স্থির, এমন সহায়্য অথচ
স্বয়ংসহায়, এমন প্রফুল্ল অথচ ত্রীড়াময়, এমন আর আছে কি ?
পরিচিত অথচ অত্যন্ত অভিনব, মুহূর্ত্তে অভিনব মধুরিমা-
আত্মীয় অথচ অত্যন্তপর, চিরস্মৃত অথচ অদৃষ্টপূর্ব্ব—
এমন দেখি নাই, কখন আব এমন দেখিব না, এমন আর
হই কি ?

রাধারাণী বলিল.—বড়কষ্টে বলিতে হইল, কেন না চক্ষের
স্বাধীনতা, আবার সেই চক্ষের জলের উপর কোথা হইতে
তা হাসি আসিয়া পড়ে—রাধারাণী বলিল, “তা, আপনি
ক্ষণ কেবল সেই তিথারিণীর কথাই বলিলেন, আমাকে যে
দর্শন দিয়াছেন, তা ত এখনও বলেন নাই ।”

হাঁ গা এমন কবিতা কি কথা কহা যায় গা ? মহাব গলা
কঁাদিতে ইচ্ছা করিতেছে, প্রাণেশ্বর ! ছুঃখিনীর সর্ব্বস্ব !
বাহু ত ! বলিয়া যাহাকে ডাকিতে ইচ্ছা করিতেছে, আবার
সেই সঙ্গে “ হাঁ গা সেই রাধারাণী পোড়ারমুখী তোমার
হয় গা ” বলিয়া তামাসা করিতে ইচ্ছা করিতেছে—তার সঙ্গে
নি, মশাই, দর্শন দিয়াছেন, এই সকল কথা নিয়ে কি কথা
যায় গা ? তোমরা পাঁচজন, রসিকা প্রেমিকা, বাক্চতুয়া

বয়োধিকা, ইত্যাদি ইত্যাদি আছ, তোমরা পাঁচজনে বল দেখি, ছেলেনান্নম রাধারানী কেমন করো এমন করো কথা কয়গা ?

বাধারানী মনে একটু পরিতাপ করিল, কোন না কথাটা একটু ভৎসনার মত হইল। রুক্মিণীকুমার একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন,

“তাই বলিতেছিলাম। আমি সেই রাধারানীকে চিনিতাম—রাধারানীকে মনে পড়িল, একটু—এতটুকু—অন্ধকার রাতে জ্ঞানাকির ন্যায়—একটু আশা হইল, যে যদি এই রাধারানী আমার সেই বাধারানী হয় !”

“তোমার রাধারানী !” রাধারানী ছল ধরিয়া হাসিল।

হাঁ গা, না হেসে কি থাকা যায় গা ? তোমরা আমার বাধারানীর নিন্দা করিও না।

রুক্মিণীকুমারও মনে চল ধরিল—“তুমি হইয়াছি—আপনি নই।” প্রকাশো বলিল, “আমারই রাধারানী। আমি এক-রাত্রি মাত্র তাহাকে দেখিয়া—দেখিয়াছিই বা কেমন করিয়া বলি—এই আট বৎসরেও তাহাকে ভুলি নাই। আমারই বাধারানী।”

রাধারানী বলিল, “হোক, আপনারই রাধারানী !”

রুক্মিণী বলিতে লাগিলেন, “সেই ক্ষুদ্র আশায় আমি কামা খাবাবুব জ্যেষ্ঠ পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম, রাধারানী কে ? কামাপ্যা বাবুব পুত্র সবিস্তারে পরিচয় দিতে বোধ হয় অনিচ্ছুক ছিলেন, কেবল বলিলেন, ‘আমাদিগের কোন আত্মীয়ের কন্যা।’ সেখানে তাঁহাকে অনিচ্ছুক দেখিলাম, সেখানে আর অধিক পীড়াপীড়ি কবিলাম না, কেবল জিজ্ঞাসা করিলাম, রাধারানী কেন রুক্মিণীকুমারের সন্ধান করিয়াছিলেন শুনিতে পাউ কি ? যদি প্রয়োজন হয়, ত বোধ করি, আমি কিছু সন্ধান দিতে

পারি। আমি এই কথা বলিলে, তিনি বলিলেন, ‘কেন রাধারাণী! কল্পিণীকুমারকে খুঁজিয়াছিলেন, তাহা! আমি সবিশেষ জানি না; আমার পিতৃঠাকুর জানিতেন; বোধ করি আমার ভগিনীও জানিতে পারেন। যেখানে আপনি সন্ধান দিতে পারেন বলিতেছেন, সেখানে আমার ভগিনীকে ভিজ্ঞাসা করিয়া আসিতে হইতেছে।’ এই বলিয়া তিনি উঠিলেন। প্রত্যাগমন করিয়া তিনি আমাকে যে পত্র দিলেন, সে পত্র আপনাকে দিয়াছি। তিনি আমাকে সেই পত্র দিয়া বলিলেন, আমার ভগিনী সবিশেষ কিছু ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বলিলেন না, কেবল এই পত্র দিলেন, আর বলিলেন, যে ‘এই পত্র লইয়া তাঁহাকে স্বয়ং রাধারাণীর কাছে যাইতে বলুন। স্বয়ং রাধারাণী সন্ধান দিবেন ও লইবেন।’ আমি সেই পত্র লইয়া আপনার কাছে আসিয়াছি। কোন অপরাধ করিয়াছি কি?’

রাধারাণী বলিল, ‘করিয়াছেন। তাহা পশ্চাৎ বলিব কি? এক্ষণে ইহাই বলি, যে আপনি মহাত্মনে পতিত হইয়াই এখানে আসিয়াছেন। আপনার রাধারাণী কে তাহা আমি চিনি না। সে রাধারাণীর কথা কি, শুনিলে বলিতে পারি আমি হইতে তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যাইবে কি না।’

কল্পিণী সেই রথের কথা সবিস্তারে বলিলেন কেবল নিজ-দত্ত অর্থ বস্ত্রের কথা কিছু বলিলেন না। রাধারাণী বলিলেন,

“এই জন্য ভিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, যে যদি আপনি কোন অপরাধ করিয়া থাকেন, তাহা সাহস করিয়া বলিব কি? আপনাকে কোন কথা বলিতে সাহস হয় না, কেন না আপনাকে দয়ালু লোক বোধ হইতেছে না। যদি আপনি সেরূপ দয়ার্জ-চিত্ত হইতেন, তাহাহইলে, আপনি যে ভিত্তরী বালিকার কথা বলিলেন, তাহাকে অমন হৃদশাপনা দেখিয়া অবশ্য তাহার

কিছু আনুকূল্য করিতেন। কই, আনুকূল্য করার কথা ত কিছু আপনি বলিলেন না ?”

রুক্মিণীকুমার বলিলেন, “আনুকূল্য বিশেষ কিছুই করিতে পারি নাই। আমি সেদিন নৌকাপক্ষে রথ দেখিতে আসিয়াছিলাম—পাছে কেহ জানিতে পারে, এই জন্য ছদ্মবেশে রুক্মিণীকুমার রায় পরিচয়ে লুকাইয়া আসিয়াছিলাম—অপরাহ্নে ঝড় বৃষ্টি হওয়ায় বোটে থাকিতে সাহস না করিয়া একা তটে উঠিয়া আসিয়াছিলাম। সঙ্গে যাহা অল্প ছিল, তাহা রাধারাণীকেই দিয়াছিলাম। কিন্তু সে অতি সামান্য। পরদিন প্রাতে আসিয়া উহাদিগের বিশেষ সংবাদ লইব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু সেই বাত্রে আমার পিতার পীড়ার সংবাদ পাইয়া তখনই আমাকে কাশী যাইতে হইল। পিতা অনেক দিন রুগ্ন হইয়া রহিলেন, কাশী হইতে প্রত্যগমন করিতে আমার বৎসরাধিক বিলম্ব হইল। বৎসব পরে আমি ফিরিয়া আসিয়া আবার সেই কুটীরের সন্ধান করিলাম—কিন্তু তাহাদিগকে আর সেখানে দেখিলাম না।”

বা। আপনি রাধারাণীকে যেক্রম ভাল বাসেন দেখিতেছি, তাহাব কারণ জানিবার জন্য আমার বড় ব্যস্ততা হইতেছে। দ্বীলোকে অমন ব্যস্ত হইয়াই থাকে। তাই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিতেছে। বোধ হয় সে রথের দিন নিরাশ্রমে, বৃষ্টি বাদলে, আপনাকে সেই কুটীরেই আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। আপনি কতক্ষণ সেখানে অবস্থতি করিলেন ?

রু। অধিকক্ষণ নহে। আমি যাহা রাধারাণীর হাতে দিয়াছিলাম, তাহা দেখিবার জন্য, রাধারাণী আলো জালিতে গেল—আমি সেই অবসরে, তাহার বস্ত্র কিনিতে চলিয়া আসিলাম।

রাধা। আর কি দিয়া আসিলেন ?

ক। আর কি দিব ? একখানা ক্ষুদ্র নোট ছিল, তাহা কুটী
রে রাখিয়া আসিলাম ।

রাধা । আমার অতি সামান্য একটা প্রয়োজন আছে ।
আসিতেছি । একটু অপেক্ষা করুন ।

সেই নোটখানি রাধারাণী অদ্যাপি যত্নে রাখিয়াছিল—তাহা
বাহির করিয়া আনিল । আসিয়া বলিল,

“নোটখানি ওরূপে দেওয়া বিবেচনাসিদ্ধ হয় নাই
তাহারা মনে করিতে পারে, আপনি নোটখানি হাটাইয়া
গিয়াছেন ।”

ক। না, আমি পেন্সিলে লিখিয়া দিয়াছিলাম, “রাধারাণী
জননী ।” তাহাতে নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলাম, “রুক্মিণীকুমার
বায় ।” যদি সেই রুক্মিণীকুমারকে সেই রাধারাণী অনেক
করিয়া থাকে, এই ভবময় বিজ্ঞাপনটি তুলিয়া বাখিয়াছিলাম ।

রাধা । তাই বলিতেছিলাম, আপনি গুরুত্ব অপরাধ কৰি-
মাছেন । যে আপনাব শ্রীচরণদর্শন জননী এত কাতবা তাহা-
কে এত দিন দেখা দেন নাই কেন ? সেই রাধারাণী সেই
রুক্মিণীকুমারের সন্ধান করিতেছিল কিনা, এই দেখুন ।

এই বলিয়া রাধারাণী সেই নোটখানি রুক্মিণীকুমারের হাতে
দিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণতা হইয়া বলিলেন, “পদু, সে দিন তুমি
আমাদিগের জীবনদান করিয়াছিলে । এ পৃথিবীতে তুমি আমার
দেবতা ।”

৬

রাধারাণী যুক্তকরে বলিলেন, “আপনি বলিয়াছেন, আপ-
নকার যথার্থ নাম রুক্মিণীকুমার নহে । আমি ঐতাকে আবাস্য
দেবতা মনে করি, তাহার নাম জানিতে বড় ইচ্ছা করে ।”

রুক্মিণীকুমার বলিলেন, “আনার নাম দেবেন্দ্রনারায়ণ রায় ।”

রাধা। রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়ের নাম শুনিয়াছি।

রু। লোকে অমন সকলকেই রাজা বলে। কুমার দেবে-
ন্দ্রনারায়ণ রায় বলিলেই আমার যথেষ্ট সম্মান হয়।

বাধা। এক্ষণে অ'মার সাহস বাড়িল; আপত্তি আমার
স্বজাতীয় জানিয়া, স্পর্ধা হঠাৎ হে যে, আপনাকে আজি আমার
আতিথা স্বীকার করিতে বলি।

রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন, “আমি না ভোজন করিয়া
তোমার বাড়ী হঠাৎ যাউন না।”

বাধাবাগীর আশ্রয় পাইয়া, দেওরান্জি আসিয়া রাজা দেবেন্দ্র-
নারায়ণকে বহির্বাটীতে লইয়া গিয়া যথেষ্ট সমাদর করিলেন।
যথাসময়ে রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ ভোজন করিলেন। রাধারাগী
স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে ভোজন করাইলেন। ভোজনান্তে
রাধাবাগী বলিলেন,

“একদিন হঠাৎ আমার প্রত্যাশা ছিল যে একদিন না এক-
দিন আপনার দর্শনলাভ করিয়া আপনার পূজা করিব। কিছু
পূজার উপকরণ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি। এই হার ছড়াটি
অতি সামান্য, কিন্তু আমি দিয়াছি বলিয়া রাগীজি যদি ব্যবহার
করেন, তবে আমি কৃতার্থ হই।” এই বলিয়া রাধারাগী এক
মহামূলা বহুশতবৃহদাকার হীৰকথণ্ড পচিত, গৃহিত নক্ষত্রমালা-
ভূলা পভাশালী হার বাহির করিলেন। দেবেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন

“বাগীজি? রাগীজি কেহ নাই। দশবৎসর হইল আমার
পরিবার গত হইয়াছেন। আব আমি বিবাহ করি নাই।”

রাধারাগীর মাথা ঘুরিয়া গেল। বহুকষ্টে, মন স্থির রাখিয়া
—মন ঠিক স্থির রহিল, কথা শুনিয়া এমনও বোধ হয় না—
রাধারাগী বলিল,

“যাহা আপনার জন্য গড়াইয়াছি, তাহা আপনাকেই গ্রহণ

করিতে হইবে। অনুমতি করেন ত ও হার আপনাকেই পরাইয়া দিই।”

এই বলিয়া রাধারাণী হাসিতেই সেই নক্ষত্রমালাতুলা হার দেবেন্দ্রনারায়ণের গলায় পরাইয়া দিল। দেবেন্দ্রনারায়ণ আপনাকে এইরূপ সজ্জিত দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন,

“এ হার আমারই হইল ?”

রাধা। যদি গ্রহণ করেন।

দে। গ্রহণ করিলাম। এখন আমার বস্তু আমি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে দিতে পারি ?

রা। যাহা আপনার যোগ্য নহে, তাহা অন্যকে দান করাই রাজাদিগের রীতি।

দে। এ হার আমার যোগ্য নহে—অথবা আমি ঈহাধ যোগ্য নহি। তুমিই ইহার যোগ্য—তোমাকেই এ হার দান করিলাম।

এই বলিয়া দেবেন্দ্রনারায়ণ সেই হার, রাধারাণীর গলায় পরাইয়া দিলেন।

রাধারাণী অসম্বলিত হইল না। মুখ নত করিয়া, গৃহস্থ হাসিতে লাগিল; একই বার মুখ তুলিয়া দেবেন্দ্রনারায়ণের মুখপানে চাহিতে লাগিল। দেবেন্দ্রনারায়ণ বৃষ্ণিলেন। বলিলেন,

“আমি ও হার লইব না, তাই তোমায় দিলাম। আমায় অন্য একছড়া দাও ?”

রাধা। কোনছড়া ?

দেবেন্দ্র বলিলেন, “তোমার গলায় যে ছড়া আগে হইতে আছে।”

রাধারাণী পরিচারিকাকে ডাকিয়া বলিলেন, “চিত্রে এখনে আছিল কি ?”

চিত্রা, অন্তরাল হইতে দেখিতেছিল । বলিল, “আছি ।”

রাধারাণী বলিলেন, “তোমার শাঁকটা কোথা ?”

চিত্রা বলিল, “এইখানে আছে ।”

রাধা । তবে বাজা ।

এই বলিয়া রাধারাণী, আপনার নিজের হার গলা হইতে খুলিয়া, দেবেন্দ্রনারায়ণকে পরাইয়া দিলেন ।

চিত্রা, উচ্চরবে শাঁক বাজাইল ।

তারপর রীতিমত বিবাহ হইল কি ? হটল নৈকি । বসন্ত আসিল, তাহার ভাইয়েরা আসিল, রাজা দেবেন্দ্রের কত লোক আসিল—কিন্তু অত কথা আর তোমাদের শ্রুনে কাজ নাই ।

সমাপ্ত ।

